হারানো খাতা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ভূদেব পাবলিসিং হাউস,

৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক—১৩৩০ মূল্য আড়াই টাকা

ভূদেব পাব্লিশিং হাউস
প্রকাশক
শ্রীভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়
৪৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ২৩৮৭২ Date..........

প্রিণ্টার
শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়
শুভোদয় প্রেস
৪৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমান কুমারদেব মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ ভাজনেষু

পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা

জীবন খাতার প্রতি পৃষ্ঠা অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রাখিও। পিতৃ পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক অক্ষয় যশের তুল্যাং। গ্রহণ করিও। কীর্ত্তি দ্বারা চিরজীবী হও।

তোমার শুভার্থিনী—

ছোট দিদি

ভরি

ভূদেব প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত :—

পারিবারিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন (উৎকৃষ্ট বাঁধান)	১৷৹
সামাজিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (উৎকৃষ্ট বাঁধান)	২৷৹
আচার প্রবন্ধ সকলের অবশ্য পাঠ্য (উৎকৃষ্ট বাঁধান)	২৷৹
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ) সাহিত্যসেবীগণের আদরের ধন	১৲
বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) ৭১টী প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যে ঝলমল করিতেছে	১৲
পুষ্পাঞ্জলি ৺ভূদেব বাবুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ	৷৹
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস কল্পনার সহিত স্বদেশ প্রেমের এমন মিল বাঙ্গালার আর কাহারও কোন রচনায় মিলিবে না	৷৹
ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস	৷৹
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অভিভাবক ও অধ্যাপক উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক	১৲
রোমের ইতিহাস (সরল ভাষায় লিখিত, উপন্যাসের ন্যায় মধুর)	৸৹
গ্রীসের ইতিহাস ঐ	৷৹
ইংলণ্ডের ইতিহাস ঐ	১৲

পূজ্যপাদ ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত :—

সদালাপ	**১ম ভাগ**	সুচরিত্র গঠনে এবং জীবনীশক্তি সম্বর্দ্ধনে ·যক	১৲
স· ·াপ	**২য় ভাগ**	ঐ (বাঁধান)	১৲
স· ·াপ	**৩য় ভাগ**	ঐ ,,	১৲
সদালাপ	**৪র্থ ভাগ**	ঐ ,,	১৲
ভূদেব চরিত	**১ম ভাগ**		২৲
ঐ	**২য় ভাগ**		২৲
ঐ	**৩য় ভাগ**		২৲
আমার দেখা লোক		(উৎকৃষ্ট বাঁধান)	২৲
নেপালি ছত্রি		নেপালের বিচিত্রময় ইতিহাস	৸৹
অনাথ বন্ধু		(উপন্যাস) আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী	১৷৹

১৩এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হারানো খাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বার খোল ওগো   দ্বার খোল ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ.
ঘর ছাড়া মোরে   যে করিল ওরে,
তারই ঘর খুঁজি দেশ দেশ।
—পরিমল।

সমস্ত দিনের আমোদপ্রমোদ পরিসমাপ্ত করিয়া যখন সপারিষদ রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুর প্রমোদোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাগমন কল্পনায় লাল কঙ্করযুক্ত—ঝাউ, কামিনী, করবী এবং অরো কেরিয়া কুঞ্জচ্ছায়া-সুশীতল—উদ্যানপথ অতিক্রম পূর্ব্বক ফটকের অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন তখন সবেমাত্র সরমরাগজড়িত শিথিলচরণে সন্ধ্যাদেবী সেই কাননপথে নামিয়া আসিতেছেন।

বসন্তের অপরূপ সজ্জাসম্ভারে সেদিন রাজোদ্যানের আগাগোড়া ভরিয়া আছে। কেয়ারি করা যুঁই, মল্লিকার আপাদমস্তকের সবটুকুই ফুলে ভরা—গন্ধের পিচকারী দিকে দিকে ছুটিতেছে। রাজা বাবুর বড় সাধের গোলাপ বাগানে বর্ণ-গন্ধের সমারোহটা সব চেয়ে বেশী। ফুটকে লাল 'মণ্টিকৃষ্ণ' বহুদলযুক্ত সুবৃহৎ 'ভিক্টোরিয়া,' হল্‌দে গোলাপ, সাদা গোলাপ এবং মোমে গড়ার মত ছোট ছোট গোলাপী গোলাপগুলি সত্য সত্যই বাগানটাকে আলো করিয়া রহিয়াছে।

একধারে বিশেষ নামজাদা কলমের আমগাছে মুকুল দেখা দিয়াছে,

ওদিকে সখের ঝিলে সাধের তরণী "পরিমল" ভাসিতেছে; বাবুরদল এতক্ষণ উহাতেই জল-বিহার করিতেছিলেন। এদিকে সেদিকে দুচারিটা কণ্ঠিতিলকপরা উড়িষ্যাবাসী মালি ক্ষিপ্রহস্তে এগাছ ওগাছ হইতে ফুলপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বাবুদের জন্য তোড়া প্রস্তুত করিতেছিল। রাজাবাহাদুরের বন্ধুবর্গ অন্যমনস্কভাবে অলসকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন,—

হেলা ফেলা সারাবেলা
একি খেলা আপন সনে,—
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।

ফটকের বাহিরে একখানা মোটর গাড়ী ও হাতীর মত বড় কালো ঘোড়া যোতা একখানা ঝকমকে ল্যাণ্ডো ইঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাবুদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চামরঝুলান ঝুটাজরির চমকদার পোষাকপরা সহিস কোচম্যান, মায় যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গালপাট্টাওয়ালা, দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বাগানবাড়ীর দ্বারপালেরা আভূমি নত হইয়া সেলাম ঠুকিল।

তখন রাজা নরেশচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তাহলে নলিন! আজ বাড়ীই ফেরা যাক্—সন্ধ্যেও ত হয়ে গেছে; আর একদিন তখন তোমাদের গান শোনান যাবে, কি বলো হে?"

নলিন্ বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল সেই সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোকটী একটু অনিচ্ছাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছাড়াছাড়া কথায় জবাব দিলেন, "সে আপনার অভিরুচি। আমি আর তাতে কি বল্‌বো বলুন? তবে দেখুন, সব বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনি যেন সেই সীমাটা না ছাড়িয়ে যান, এই টুকুই শুধু আমাদের মনে করিয়া দেওয়া।"—এই বলিয়া আর একজনের দিকে

চাহিয়া নলিনবাবু নিজের যুক্তিটাকে আর একটুখানি জোর দিবার জন্যই যেন সাক্ষ্য মানিয়া কহিলেন,—"কি বল হে ননীবাবু! অতটা বাড়াবাড়িই কি ভাল ?"

ননীবাবু এইভাবে সম্বোধিত হইয়া একটুখানি বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন। এই লোকটী নরেশচন্দ্রের ধাতুর সহিত আজীবন ধরিয়া বিশেষভাবেই পরিচিত ছিল। সকল বিষয়েরই চরমে গিয়া পৌছানই যে ওই মানুষটীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বা দোষ এ খবর সে জানিত, তাই ইহার বিপক্ষে মত দিতে গিয়াও তাহার বাধিল।

নরেশ একটু অসহিষ্ণুভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ভাবের উচ্ছ্বাসে সীমা যদি কোথাও ছাপিয়ে পড়ে আমি তাতেও কোন দোষ দেখিনে। মাপকাটি দিয়ে মেপে মেপে যে পথচলা, তারচেয়ে আমার পক্ষে অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁৎরে পার হওয়াও ঢের সহজ।"

কথার সুরে ও ভাবে অসন্তোষের আবেগ বুঝিয়া সহচরেরা নিজেদের পথ চিনিয়া লইল। ননী বলিল "আমারও সেই মত। আমাদের রাজার এখন 'সুষমাকুটীরের' চাইতে 'রাণীসদনে' হাজির হয়ে পড়া ঢের বেশী সঙ্গত।"

রাজার প্রবীণ বন্ধুটী এতক্ষণ স্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; এতক্ষণে নিজের আসরে নামিবার সময় আগত বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"তা বই কি! নাতি আমার এখন ঘরে নূতন রাণী এনেছেন, কুটীরবাসী হতে গেলেন এখন কোন দুঃখে! ওসব পচা পরামর্শ তুমি কাণে তুলোনা হে ভায়া, চটপট গাড়ীতে উঠে, গাড়ী ছুটিয়ে দিয়ে একেবারে সেই পদপল্লবে গিয়ে হাজির হওগে। যদি ইতিমধ্যেই সেখানে মানভঞ্জনের অবস্থা ঘটে উঠে থাকে, তাহ'লে সেই পা দুটি বুকে তুলে নিয়ে এম্‌নি করে গাইবে,—

'ভাঙ্গবো বাঁশি ত্যজবো প্রাণ,
রাধে ! এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
নহে,—এই পায়ের নূপুর বেঁধে গলে—
আমি পশিব যমুনা জলে—'

"আরে দাদা, এ যে রীতিমত কেত্তন সুরু করে দিলে। তবে না হয় আর একটু বসে গানটার শেষ পর্য্যন্ত শোনাই যাক্ না।"

"ঠাকুদ্দা আমাদের যত বুড় হচ্চেন, ততই যেন ওঁর রসের ধারা প্রাণের মধ্যে থেকে উথ্‌লে উঠে গড়িয়ে গড়িয়ে উপ্‌চে পড়চে।"

"ঠিক বলেচ দাদা ভাই ! এরই জন্মেই না শিং ভেঙ্গে এই সকল বৎসবৃন্দের মধ্যে বিরাজ কর্‌চি, বলি কি যৌবনের ওই সহস্র বাতির মুখ থেকে একটু একটু ফিন্‌কিও যদি উড়ে এসে এই পোড়া শল্‌তেটায় কোন গতিকে ঠেকে যায়।"

উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যে শব্দবিরল কাননপথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণপরে নরেশচন্দ্র বলিলেন,—"কি গ্রহ ! আজ কি এইখানেই রাত কাটাবে নাকি ?"

ঠাকুরদা আলস্যবিজড়িত ভঙ্গিতে কহিয়া উঠিলেন, "তা যদি বল্লে ভায়া তবে বলি,—তোমার ঠান্‌দির স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় ঘরটান তো আমার ফুরিয়েই গেছে। আজ এই কুঞ্জবনটার মায়া যেন আমার কাটতেই চাইচে না !"

'নিকুঞ্জ কাননে রাধা শ্যামসোহাগিনী,' 'আপনি এখন রাধাভাবে আছেন নাকি ?'

"তা না হয় থাকলে,—কিন্তু এখানে তো অপর্য্যাপ্ত ফুলের গন্ধ ও মলয় সমীরণ সেবন করেও তোমার ও রাক্ষুসে পেট ভরবে না দাদা। সেটার সম্বন্ধে—"

"আঃ পাগল ! তোরা এখনও নেহাৎ নাবালক আছিস, দেখতে

পাই! ওরে হরিধন ঘোষালকে কি তেমনই কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ তোরা? এই ক্যাম্বিসের ব্যাগে যা ভরে নেওয়া গেছে, সে তোদের মতন চারটে জোয়ানমর্দ্দর খোরাক। তার উপর এবেলা তোরা মুখ্যুরা যখন সরবতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলি, আমি সেই সুযোগে ওবেলার অবশিষ্ট তালশাঁস সন্দেশগুলো আর গোলাপজলভরা রসগোল্লা গণ্ডা আষ্টেক পার করে দিয়েছি।”

“শোন কথা! ঠাকুরদা বলে কিরে? এ কুম্ভকর্ণ দাদাটীকে ঘাড়ে নিয়ে পুষ্‌তে ভাই তোমাদের মতন রাজারাজড়াদেরই পোষায়। আমাদের মত হাল্কা কাঁধে—”

“যাঃ—আমাকে কি তেম্নি ছ্যাবলা পেয়েছিস রে! যে আমি নিজের ভার সইবার মতন একটা আশ্রয়ও খুঁজে নিতে পারিনে? জান না কি মাধবিকা সহকার তরু ব্যতীত অপর কাহাকেও আশ্রয় করে না—”

আবার একটা তরল হাস্যতরঙ্গ উত্থিত হইয়াই মধ্যপথে অকস্মাৎ কিসের একটা বাধায় চকিত হইয়া থামিয়া গেল।

ফটকের পাশেই যে প্রকাণ্ড পাকুড়গাছটি অনেকখানি স্থানে স্বায়ত্ত শাসন বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ হইতে একটা আকস্মিক ক্ষীণস্বর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, “অনাহারে প্রাণ যায়, যদি কেউ একটুখানি দয়া করেন—”

একসঙ্গে সবকয়টা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হইল। তা, ব্যাপার এমন কিছুই অসাধারণ নয়। সদাসর্ব্বদা যে রকম ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দীন ভিখারীকে ওই রকম জায়গাতেই দেখিতে পাওয়া সম্ভব, এও ঠিক সেই একই ব্যাপার। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়পরা একটা অনশনক্লিষ্ট কঙ্কাল-শীর্ণ ভিখারী পথিক পথের ধারে দারুণ নৈদাঘ রৌদ্রের তাপদাহ কথঞ্চিৎ নিবারণাশায় গাছের ছায়ার আশ্রয়ে পড়িয়া

কাতরকণ্ঠে নিজের প্রবল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ধনিবৃন্দের প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের এক কণা মাত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এই তো জগৎ! সংসারের নিয়মই ত এই! সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজসিংহাসনের পদতলে অনশনব্রত ভিখারীর ধূলিশয্যা এত আজ নূতন নয়। এ সংসারে জন্মিয়া এই দৃশ্যের মাঝখানেই মানুষের যে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। এ দৃশ্যে মানুষ অহরহই ত ডুবিয়া আছে। এর চেয়ে সহনীয় তাহার বলিতে গেলে আর কিছুই নাই। যে ঐশ্বর্য্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সে ভ্রমেও কখন মনে করে না যে তাহার সেই সম্মানের আসন কত দুঃখার্ত্তের মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া রচিত; কখন ভাবিয়া দেখে না যে, যে দীন দরিদ্রের বক্ষ আজ সামান্য কীটানুর মতই অনায়াসদর্পভরে নিজের মোটরের চাকার তলায় পিষিয়া দিয়া সে অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, তার সে দর্পও শুধুই সেই অবহেলিত নগণ্যের কৃপার দান। বস্তুতঃ, দরিদ্র বড় সহিষ্ণু, সে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ধনীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়; তাই না তারা তাদের এমন করিয়া দলিতে অবসর পায়! এরা যদি একবার নিজের শক্তি বুঝিয়া ধনীর অত্যাচারের প্রতিবিধান চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে মহামহৈশ্বর্য্যময় সিংহাসনও যে সেই দারিদ্র্যশক্তির পদতলে চূর্ণিত হইয়া ধূলিধূসর হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তা যাক্ সে কথা,—সেই ভিখারীটার প্রতি নজর পড়িতেও একটা তাচ্ছল্যভরা অধরকুঞ্চনেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত, যদি না ঠিক সেই সময়েই রাজাবাবুর দ্বারবান ও পদাতিকদ্বয় রাজাবাবুকে সেই অভাগাটার দিকে চোক ফিরাইতে হওয়ায় নিজেদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি বোধে উহার ক্ষালনার্থ সেই হতভাগ্য ভিখারীর দিকে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইত।

"এই বদ্‌মাস্! এই শালে! হিঁয়া কাহে বৈঠা হো! জলদি নিকালো

হিঁয়াসে”—এবং ইহাতেও তাহাকে পলায়নপরাঙ্মুখ দেখিয়া দুইজনে তাহার দুইটা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টভাষায় “নিকালো শালে”, “ভাগো হিঁয়াসে”, “তু চোট্টা হ্যায়”. ইত্যাদি প্রিয় সম্ভাষণও চলিতে লাগিল।

লোকটা উঠিল না, পরন্তু নিঃশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়াই বড়লোকের নিমকহালাল ভৃত্যবর্গের বজ্র-কঠিন হস্ত হইতে মুক্তি পাইল না।

“এঃ চোট্টা আদমি ঢং দেখাতে হো—” এই বলিয়া যদুনন্দন চৌবেজী নিজের সরল শালযষ্টিবৎ দেহখানি ঈষৎ বক্র করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইতে গিয়া সহসা পিছনে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোরকণ্ঠের সম্বোধনে বিস্ময়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল যে, সেই—“ওঝা, চৌবে, তফাৎ যাও!” বলিয়া তাহাদের অক্ষুণ্ণ মহিমার খর্ব্বকারী, স্বয়ং তাহাদেরই রাজা-বাবু!

ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা শিকার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নরেশচন্দ্র সেই লাঞ্ছিত ভিখারীটার নিকটে আসিয়া ব্যগ্র-করুণকণ্ঠে বলিলেন “এরা তোমায় লাগিয়ে দিয়েছে কি? আহা, তোমার দুদিন খাওয়া হয়নি বল্‌ছিলে না? এই নাও,—কিছু দিচ্ছি।”

কোন সাড়া নাই, সন্ধ্যার ছায়ায় বৃক্ষপত্রের সমাবেশে ভাল করিয়া দেখা গেল না, তথাপি যতটুকু দেখা যায় তাহাতে বুঝা গেল যে, গাছের তলায় যে লোকটা পড়িয়া আছে, বক্ষে তাহার স্পন্দন নাই। নরেশচন্দ্রের সর্ব্বশরীরে একটা অতর্কিতভয়ের বেদনা তাড়িৎ হানিয়া গেল,—এই মুষ্টিভিক্ষার কাঙ্গাল হতভাগ্যকে, মাত্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাওয়ার অপরাধে তাঁহারই অন্নপুষ্ট লোক দুইটা মারিয়া ফেলিল নাকি?

তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে তাহার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই তাঁহার অন্তরের সমস্ত মমতাসাগর

এককালে বিমথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া যে মুখখানা চোখে পড়িল, তাহা তাঁহার শরীরে মনে ঈষৎ একটা অজ্ঞাত শিহরণও আনিয়া দিল।—কত ক্ষীণ, কত পাণ্ডুর এবং কি ভীষণই সে মুখ।—উঃ কি ভীষণ!—মানুষের যে তেমন মুখ হয়, তাহা যেন ইহার পূর্ব্বে ভাল করিয়া তাঁহার অনুভূতিই ছিল না। এক লহমার সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া সেখানার দিকে চাহিতে গভীর মমতা বেদনা এবং আতঙ্কের মিশ্রণে এই ভাবটাই তাঁহার মনে জাগিল। তারপর পরক্ষণেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান দ্বারবানদের সম্বোধন করিয়া "জলদি পানি লে আও"—এই হুকম দিয়া ততোধিক বিস্ময়স্তম্ভিত বন্ধুবর্গের দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন "করুণা! একবার এসতো ভাই, এর হাতটা দেখে যাও তো।" তাঁহার স্বরে তখন বিস্ময়ের লেশও বর্ত্তমান নাই।

ডাক্তার করুণানিধান বাবু সঙ্কোচের সহিত কাছে আসিয়া বলিলেন "কে তার ঠিক নেই, কি রোগ আছে, কাপড় চোপড় যাচ্ছেতাই, ওকে ছোঁয়ানেপা করাটা কি ঠিক?"

নরেশচন্দ্র কহিলেন "তোমরা হাঁসপাতালের মড়া শুদ্ধ ঘাঁট। এ হয়ত এখনও জ্যান্ত মানুষ। একে ছুঁতে দোষ কি?"

করুণা বাবু ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে সসঙ্কোচে সেই ভিখারীর হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন "না, তা নয়;—আমরা ডাক্তার আমাদের সবই করতে হয়, সে আমি বলছিনে, তোমার কথাই বলছি। হ্যাঁ, এখন, বেঁচে আছে বটে; তবে বড্ডই দুর্ব্বল,—কিছু খেতে না পেলে বোধ হয় বেশীক্ষণ আর বাঁচতে পারবে না।"

সম্ভপ্রত্যাবৃত্ত চৌবের নিকট হইতে জলের লোটাটা লইয়া, মূর্চ্ছিতের মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, নরেশ উহাকে আদেশ করিলেন, "চৌবেজি, বহুত জলদি গরম দুধ লেআনে হোগা।"—

হুকুম শুনিয়াই চৌবেজীর মনের উষ্মা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিল—“আরে মহারাজ! আপ হুকুম তো দেদিয়া—লেকিন হাম কাঁহাসে এত্তা জলদি গরম দুধ কা বন্‌বস্‌ করে ?—ইয়ে আপ কা কল্‌কত্তা সহর হ্যায় কি যো যো—”

নরেশ বিরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেই করুণাবাবু কহিলেন “সত্যিতো এখানে এক্ষুণি দুধ পায় কোথায় ? তা কাজ নেই সে চেষ্টায়, আমার কাছে এক শিশি ‘ষ্টিমুলেন্ট’ আছে, তাই থেকে আউন্সটাক জল মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই বেঁচে যাবে ’খন।”

মূর্চ্ছাহত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পাশ ফিরিল, অল্পপরে চোখ মেলিল, এবং পদাতিকের আনীত গাড়ীর লণ্ঠনের তীব্র আলোকে স্বপ্ন-দৃষ্টের মতই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের উপর নত হইয়া নরেশ ডাকিলেন,—“একটু বল পেলে কি ? কিছু ভাল বোধ হচ্ছে ?”

লোকটী ক্ষণকাল নির্ব্বাকবিস্ময়ে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরি-শেষে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল “হুঁ।”

ডাক্তার আবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—“বাপ্‌! মানুষের নাড়ী এত ক্ষীণও হয়! ঠিক যেন একগাছি চুলের থাইয়ের মত অতি ধীরে নড়ছে, আছে কি না আছে। এখন এসো রাজা। ওহে, আজ রাতটা এইখানেই চুপ করে পড়ে থেকো,—দেখ চৌবেজি ! কাল সকালে ওকে একটু দুধ টুধ খেতে দিতে পার্‌বে তো ? সকাল বেলা—এখন বল্‌ছি না।”

চৌবে অসন্তোষের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল “জি হুজুর !”

“ব্যাস. তা’হলেই এক রকম চালিয়ে নিবে আর কি। এসো হে রাজা, রাত হয়ে যাচ্চে। আমাকে আজ আবার একবার বর্ম্মণদের ওখানে ৯টার সময় যেতেই হবে। কত হলো ? এঃ সাতটা পঁচিশ—এসো এসো।”

নরেশচন্দ্র বন্ধুর ব্যস্ততা গ্রাহ্য না করিয়া ভিখারীর সহিত কথা কহিয়া বলিলেন,—"দেখ, এই দারোয়ানগুলো বড় পাজী, ওরা আর একটু হলেই তো তোমায় মেরে ফেলেছিল, ওদের হাতে দেওয়া আর এই গাছ তলায় ফেলে দেওয়া একই কথা; তুমি আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পার্‌বে? তা'হলে দুচার দিন একটু খেয়ে দেয়ে জোর পেয়ে যেতে পার্‌তে? দেখনা একটু চেষ্টা করে, যদিই পারো।"

কথাটা শুনিয়া নরেশচন্দ্রের সঙ্গিদলের মধ্যে গভীর বিস্ময়ের স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়া ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল; আর সেই মুমূর্ষু ভিখারী—সে যেন এই অপ্রত্যাশিত অযাচিত সম্মান সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হইয়া তড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় নিজের সকল দুর্ব্বলতা এক মুহূর্ত্তে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া সচমকে উঠিয়া বসিল, এবং কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"কে আপনি মশাই? এত দয়া তো মানুষের দেখিনি! নিশ্চয়ই ভগবান নিজে ডেকে আপনাকে এ হতভাগ্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

নরেশ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান চৌবের দিকে ফিরিয়া আদেশ করিলেন,—"যদুনন্দন! হাওয়াগাড়ী ইধার লেআনে কহো,—ইস্‌কো হুঁসিয়ার হোকে সাম্‌না আসনপর উঠায় দেও।"

—:•:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আজি এসেছি তোমারই দেশে,
আমি, অতিথি তোমারই দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।"

—রবীন্দ্রনাথ।

পরদিন প্রভাতকৃত্যের সমাধানান্তে খবরের কাগজ হাতে লইবামাত্র গত রাত্রির সেই ভিখারী অতিথিটার ভীষণ মুখখানা অকস্মাৎ নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। মনে করিতেই সমস্ত শরীরটাই তাঁহার ঈষৎ যেন শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল; এবং নিরতিশয় লজ্জার সহিত মনে হইল যে, লোকে যে বলে তাঁর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি,—তা বড় মিথ্যাও নয়! সত্যই তো ওই রোগজীর্ণ ভয়ানক মূর্ত্তি ভিখারীটাকে যেমন তাঁহার দ্বারবানেরা অকারণ নিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার জন্য সেটাকে কিছু খাইতে দিয়া দুইটা টাকা দিয়া অথবা না হয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তো হইতে পারিত। তা নয়, একেবারে পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া সেটাকে নিজেদের সঙ্গে গাড়ী চড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসা হইল। গাড়ীতে আবার সে মূর্চ্ছিত হয়, ধরাধরি করিয়া নামাইয়া নীচের একটা ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়ান, ডাক্তার ডাকা, দুধ, বরফ, বলকারক ঔষধ এসব তখন না করিলেও কি আর চলিত না? এ লইয়া স্ত্রী একটুখানি চটিয়া উঠিলে তাঁহার তাহার চেয়ে বেশী চটিয়া তাহাকে কটুবাক্যে তিরস্কার,—আবার তার পরই অর্দ্ধরজনীব্যাপী চেষ্টায় মানভঞ্জন;—নাঃ— এতটা না করিলেও চলিত।

কিন্তু তখন যেটা না করিলে চলিত,—সেটা যখন করা হইয়া গিয়াছে,—এখন আর মনে মনে লজ্জিত হইলেও চারা নাই। যাহোক

ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে। লোকটাকে গাড়ী ডাকাইয়া সরকার মশাইকে সঙ্গে দিয়া হাঁসপাতালেই পাঠান যাক্। মধ্যে মধ্যে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিলে কিছু টাকা দিয়া দেওয়া যাইবে।

নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

রোগী তখনও বিছানায় পড়িয়াছিল। ঘরের সব দরজা জানালাই বন্ধ ছিল. নরেশচন্দ্র কাছাকাছি কাহাকেও না দেখিয়া, একহাতে নাকে সুগন্ধি রুমাল চাপিয়া স্বহস্তেই একটা জানালার কবাট মুক্ত করিয়া দিবা মাত্র প্রভাত সূর্য্যের এক ঝলক কনকরশ্মি অঞ্জলীভরা স্বর্ণরেণুর মতই সেই তাপিতের শীর্ণ এবং পাণ্ডু দেহের উপর যেন উপহাসের বক্র হাসির মতই ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সেই আলোর ঝিলিক যেন ওই বিশীর্ণ আড়ষ্ট শরীরটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া বলিতেছিল'—"এ ঘরে তুই কে'রে? এর মধ্যে কি তোকে মানায় না কি?"

নরেশ ডাকিলেন, "কিরে আজ কেমন আছিস্?" চমকিয়া চোক মেলিয়া চাহিতেই দুজনকার চোখেই দুরকমে বিস্ময়ের ঘন রেখা ফুটিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে প্রচুরতর করুণার সহিত আর যে ভাবটা অর্দ্ধ জাগ্রত হইল, সেটাকে ঈষৎ ঘৃণা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ভিখারীর একটীমাত্র দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নেত্রতারকায় নরেশের সুন্দর ও সুসজ্জমূর্ত্তি কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়েরই আলোক সম্পাত করিয়াছিল।

ভিখারীর মুখে ও সর্ব্বদেহে গভীর বসন্ত ক্ষত; মুখের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ নেত্র, ললাট এবং গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ঐ অংশটা কোনরূপে অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে। জীবিত মনুষ্যের মধ্যে এমন দুরবস্থা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু— কিন্তু ওই সর্ব্বহারা ভীষণ অগ্নিদগ্ধ মুখমণ্ডলে আরও কি কিছুই দেখা যায় না? যায়। যাহা দেখা যায়

বুঝি সেইটে দেখাই আরও ভয়ানক।—তাহা এই যে, এ ব্যক্তির চিরদিনই এ অবস্থা ছিল না। একদিন সে যে মানুষের মধ্যে—শুধু তাই নয়, সুপুরুষের মধ্যেই গণ্য ছিল; সেই সকরুণ সংবাদটুকু ওই দগ্ধ উপবন তুল্য মুখখানার আশে পাশে বেদনাব্যথিত ইঙ্গিতে আজও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যে একটী চক্ষু আজও বর্ত্তমান আছে, সেইটীকে বিশাল ও বুদ্ধিব্যঞ্জক বলা যায়; মস্তকের বিরল কেশ কি সুন্দর কুঞ্চিত! দেহ যে একদিন সুপুষ্ট এবং দীর্ঘায়ত ছিল, আজও তাহার করুণ ইতিহাস সেই অকালজরায় জর্জ্জরিত শরীরে স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরিতে জগতের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট চারুশিল্পের ধ্বংসাবশেষ চোখে দেখিলে দর্শকের সমস্ত প্রাণটা মথিত করিয়া চক্ষে যেমন স্বতঃই জল আসে, বিধাতার এই উচ্চাদর্শে গঠিত মূর্ত্তির পরিণামফল দর্শনেও তেমনই করিয়া প্রাণ কাঁদিতে থাকে। নরেশচন্দ্রের কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। তাঁহার আপনা আপনি কেমন মনে হইল, আজ যে অবস্থার মধ্যে এ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতেছেন এ লোকের ঠিক সে অবস্থাপন্ন হইবার কথা নয়। যেন ইহার কোন্ অজ্ঞাত গুরুলঙ্ঘনজনিত পাপের ফলে, কোন অজানিত দুর্ব্বাসার অভিশাপে, দেবযোনি ছাড়িয়া এ একেবারে নক্রশরীর ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! বয়সই বা ইহার কি? তাঁহার চেয়েও কম হওয়া বিচিত্র নহে। সহানুভূতি ও করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটা কি বল তো?"

লোকটী একটু চিন্তিতভাবে নীরব রহিল, পরে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস মোচন করিয়া মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—"নিরঞ্জন।"

"নিরঞ্জন—কি? তোমরা?"

লোকটী আবার ভাবিল ও পরিশেষে কহিল "বৈদ্য,—আমরা দাসগুপ্ত।"

"আমারও সেই রকমই একটা ধারণা হচ্ছিল ; তোমার অবস্থা হয়ত চিরদিন এরকম ছিল না। একদিন—উচ্চ সমাজেরই একজন ছিলে তুমি, না ?

নিরঞ্জন একটুখানি যেন উত্তেজনার সহিত, ঈষৎ যেন ভীতির সঙ্গে, তাহার উপকারকের স্নেহমণ্ডিত মুখের দিকে চকিত হইয়া চাহিল, ত্রস্তস্বরে কহিয়া উঠিল "না না, ওসব কিছু অনুমান করতে যাবেন না, আমি চিরভিখারী—আমার আবার কবে ভাল দিন ছিল ; ওঃ ! সে সব এ জন্মের নয় !"

নরেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। ইহার এই দগ্ধমরুর ন্যায় ভয়াবহ জীবনের মধ্যে যে তেমনই ভীষণ কোন একটা রহস্য নিহিত আছে, ইহা যেন তিনি স্পষ্টচক্ষেই দেখিতে পাইলেন। হয়ত কোন দৈব বিড়ম্বনা, হয়ত কোন হত্যাকাণ্ড, হয় ত বা রাজনৈতিক কোন কিছু—হ্যাঁ, তাওতো বিচিত্র নয়, নাইট্রিক অ্যাসিড পিকরিক অ্যাসিডের পরিণাম—থাক এসব অনুমানে কোনই ফল নাই, বৃথাই মস্তিষ্কশক্তির অপচয় মাত্র। যাই হোক, এ ব্যক্তি ভদ্রসন্তান, অদৃষ্টবিড়ম্বিত ;—দৈবক্রমে তাঁহার দ্বারস্থ। থাক দুটো দিন এই আশ্রয়েই, কাজ কি ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া ? ডাক্তার তো বলিল যে ইহার শরীরে রোগ বলিতে কিছুই নাই, সকল রোগের মূল কারণ যাহা তাহারই প্রচুরতায়ই ইহার এমত অবস্থা, অর্থাৎ অনাহার ও অযত্নবশতঃ সমস্ত শরীরযন্ত্রেরই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছে। থাক দুদিন, হয় ত এ জীবনে বেচারী অনেক দুঃখই পাইয়াছে। হয়ত দুটো দিন বিশ্রামের কাল এর আসিয়াছে, সেইজন্যই হয়ত আমার মনেও এমন করুণা আসিয়া পড়িতেছে,—

চাহিয়া দেখিলেন ক্লান্তিভরে নিরঞ্জন আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু
কম করে মোরে দাওনি।

—বাণী

কয়েকদিন নিরঞ্জন শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল; পারিবারিক চিকিৎসক যথারীতিতে দুই বেলাই দর্শন দিয়া যেমন গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী এবং তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের শারীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অকারণ জেরা করিয়া যান, সেই রূপ যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ দর্শন দিয়া দুবার ইহার ঘরটাকেও পায়ের ধূলায় বঞ্চিত করেন না। প্রথম দু' একদিন তেমন মন দিতে পারেন নাই এবং এই দীনহীনের একশেষ ভিক্ষুকটাকে হাঁসপাতালে পাঠানর জন্যও তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন; কিন্তু ইদানীং গৃহকর্ত্তার রুচি প্রবৃত্তি-অনুযায়ী সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া উহার জন্য একটা টনিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দুবেলা আসিয়াই "কিরে একটু বল পাচ্ছিস্? আচ্ছা ওষুধটা যত্ন করে খেয়ে যা'তো, দেখ্‌বি কিনা কি রকম কাজ করে। নির্ব্বাচনটা যা করেছি সে একেবারে এক্স্‌সেলেণ্ট!"—ইত্যাদি দুটা কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেও ত্রুটি করেন না।

ডাক্তারবাবুর এমন অসাধারণ ঔষধ সেবনান্তেও যে . হতভাগা সারিয়া উঠিতে বিলম্ব করিয়া রাজবাড়ীর ভৃত্যবর্গের গলগ্রহ হইয়া রহিল, সে যে কেবল তাহার জুয়াচুরি বুদ্ধিরই খেলা, ইহাতে, বামনঠাকুর, পেঁচোর মা বা হারাধন খানসামা—ইহারা সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত সকল বিষয়ে ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও এবিষয়ে—সম্পূর্ণরূপেই একমত ছিল। আর ইহাদের নালিশ ফরিয়াদ শুনিতে শুনিতে এই দুর্ভাগ্য অতিথিটার প্রতি, এই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী যিনি—তাঁহার মনটিও বেশ ভাল ছিল না। বাড়

Public Library
Accn. No. ২৩৬-১৯ Date ....

গৃহিণীটীর নাম পরিমল, বয়স তাঁহার বাইশের উর্দ্ধে নয়; কাজেই সংসারের কুপোষ্য ইত্যাদির জন্য মাথা ঘামাইয়া, তাদের চিন্তায় সময় নষ্ট করা তাঁহার ভাল লাগা খুবই সম্ভব নহে। তবে দরিদ্রের প্রতি কোন অযথা বিদ্বেষ তাঁহার চিত্তে পোষিত ছিল না, সেজন্য ওই অশক্ত ভিখারীটাকে বাড়ী হইতে এখনঃ দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবার কোন বিশেষ আগ্রহ যে তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন ?—বামুন ঠাকুরের দল যখন তখন ভিড় করিয়া আসিয়া রুষ্ট অসন্তোষের সহিত সমস্বরে গলা ছাড়িয়া জানাইয়া যায়, "এমন করিয়া তাহাদের" পরে অবিচার হইতে থাকিলে তাহারা তেমন চাকরীর মুখে 'নুড়া' জালিয়া দিয়া যেদিকে দুচক্ষু যায় সেই দিকেই চলিয়া যাইবে। 'গতর' সুখে থাকিলে চাকরীর নাকি এ সহরে অভাব আছে? তাহারা রাজবাড়ী জানিয়া কাজে বাহাল হইয়াছিল, ভিখারীর সেবা করা তাহাদের পেশা নয়। তা'ও কি একটা সোজাসুজি ভিখারী! না আছে তার না'বার চাড়, না আছে তার খাবার চাড়, ওমা, এমনতো কোথাও দেখা যায় না। তুই ভিখারী মানুষ; তোর আবার অত কেন? যা' পেলি হাঁসহাঁস ক'রে গিলে কুটে নিয়ে বর্ত্তে যা; তা নয়, পাতের ভাত পাতেই পড়ে থাকলো, উর্দ্ধমুখে হাঁ করে ঘরের কড়িকাঠপানেই তাকিয়ে রইলেন, আবার মনে পড়িয়ে দিলে তবে খাবেন। অত কার গরজ রে বাপু? ওঁর কত কালেরই মা বোন পাশে বসে বসে খাওয়াচ্ছে কি না?"

পেঁচোর মার গায়ের জ্বালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম যে দিন সে নিরঞ্জনকে দিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাইয়া লয় তখন নিরঞ্জনের শরীর একান্ত দুর্ব্বলথাকাপ্রযুক্ত সে বাসন মাজিয়া উঠিয়াই পতনোন্মুখ হয়। কপালক্রমে কিনা ঠিক সেই সময়টিতেই সেই স্থানে নরেশচন্দ্রের অভ্যুদয়

ঘটিল! রাজাবাবুর ঘৃণাপিত্ত ত সবই চলিয়া গিয়াছে! ওই কদাকার মুখপোড়া হনুমানটাকে নিজে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া, এতটুকু বিবেচনা না করিয়াই, নিরপরাধিনী পেঁচোর মাকে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' কি বকুনিটাই না বকিলেন! শেষে হুকুম দিয়া বলিলেন, ঐ পোড়ারমুখোটা যখন জাতে বদ্দি, তখন ওর এঁটোকাঁটা কায়েত বাড়ীর দাসীচাকরে কিসের জন্যই বা ছুঁতে না পারবে? ও গুরুঠাকুরের মতন এবার থেকে বসে বসে গিল্‌বে, আর ওর পাত কুড়োবে এই ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গাকুলো কাঙ্গালের কাঙ্গাল পেঁচোর মা।—বিচারটা দশে পাঁচে দেখুক একবার!

এই সব নানা কথা শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া একদিন সদ্য নালিশের যন্ত্রণার পরক্ষণেই স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরিমল তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "অনেক দিন ত হয়ে গেল, এতদিন অবশ্যই গায়ে জোর পেয়েছে, এইবার ওটাকে যেতে বল্লেই হয় না?

নরেশ প্রথমতঃ কথাটার অর্থবোধ করিতে না পারায় জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই সহসা ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেই কহিয়া উঠিলেন, "কার কথা—নিরঞ্জনের কথা বল্‌চো?"

পরিমল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছল্যস্বরে উত্তর করিল, "কি রঞ্জন তা জানিনে, আমি ওই হাড়জ্বালানে ভিখিরিটার কথা বল্‌ছিলুম। ওর জ্বালায় বাড়ীর সব ঝি চাকরগুলো ত জ্বালাতন হয়ে ছেড়ে যেতে বসেছে।"

নরেশচন্দ্রের নেত্রে বিরক্তির ঘন ছায়া পড়িল। অসন্তোষের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাদের কি পাকাধানে ও মই দিচ্চে শুনি?"

পরিমল ও কিছু উষ্ণভাবে কহিল "মই দিচ্চে কি. কি করচে তা তারাই জানে। মোট কথা, তারা বলচে যে ও যদি থাকে, তবে ও-ই থাক্, আমরা আর তাহলে কেউ এ বাড়ীতে চাকরী করতে থাকবো না। তা সেই কি ভাল, যে খামকা একটা যে-সেভুতুড়ে

লোকের জন্য বাড়ী শুদ্ধ সব ঝি চাকর বামুন গুলো ছেড়ে চলে যাবে?"

নরেশচন্দ্র প্রথমতঃ রাগ করিয়া বলিলেন "যায় যাগ্‌গে! অমন সব হিংসুটে পাজীলোকগুলো বাড়ী ছাড়লেই আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।"

পরক্ষণেই সেই বিদ্রোহী পরিজনবর্গের অগ্রবর্ত্তিনী-স্বরূপে গৃহিণীকে—"বেশ তবে ওকে নিয়েই থেকো"—এই কথা মান ভরে বলিয়া প্রস্থানোন্মুখী দেখিয়া সহসা বিরক্তি ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, ও তাঁহার চাবিশুদ্ধ আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে কহিলেন—

"একি! তারা যায় যাবে, তা'বলে তুমিও যাচ্চ কি জন্যে? তুমি ত আর পেঁচোর মা নও যে তোমায় তার এঁটো মাজতে হয়'—হারাধন নও যে তার বিছানা পেতে দাও,—তবে, তোমার অত চটবার কারণটা কি আমায় বলতো?"

বস্তুতঃ হিসাব মত চটিবার তাঁর কোন কারণই ছিল না। কথাটা কানে গিয়া তাই পরিমলকে ঈষৎ লজ্জা দিল। সে দেখাইবার মত কোন যুক্তিও না পাইয়া শুধু একটুখানি অপ্রতিভের মৃদুহাস্য হাসিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল—

"ধেৎ,—আমি কেন চটবো? আমার আবার এতে কি? তবে অতগুলো লোক সর্ব্বদাই ওর জন্য চটে রয়েচে, যখন তখন চলে যেতে চায়, তাই, না হলে—"

নরেশ কহিলেন "দাও না চলে যেতে, কেমন যায় দেখ না। কখনো যাবে না—কক্ষনো না; সে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। এমন দিল দরিয়া মেজাজের গিন্নিটী আর ওরা পাবে কোথায় যে যাবে, শুনি? তা নয়, ওই যে একটা গরীব মানুষ না খেটে দুবেলা দু মুটো ভাত খাচ্চে; এইটেই হয়েছে ওদের সবাকার চক্ষুশূল,—তা আমি খুব জানি। যারা

নিজেরা অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন আরও বেশী করে পরকে অভাবের মধ্যে দেখতে ভালবাসে। তাই বা বল্‌বো কি, আমার ভদ্রলোকবন্ধুরাই ত সেদিন ওই আমারই চাকরের দুর্ব্যবহারে মূর্চ্ছিত, মরণাপন্ন লোকটাকে একটু যত্ন দেখানর জন্য আমার, পরে, এতই মর্ম্মান্তিক রকমে চটেছিলেন যে, দু'তিন দিন আমার সঙ্গে কেউ আর দেখাটা পর্য্যন্ত করেন নি, দেখা হলেও একটা কথা কন্‌নি। অথচ স্বকর্ণেই সবাই ডাক্তারের মুখ থেকে শুনেছিলেন যে একটু খাদ্য ও যত্ন না পেলে লোকটা খুব শীঘ্রই মারা পড়বে!"

শুনিয়া পরিমলের মনের মধ্যটা যেন একটা অতি তীক্ষ্ণ লজ্জার কণ্টকে বিঁধিয়া উঠিল। ছি ছি, সেও তো প্রায় এই মমতা হীন ভদ্রাভদ্র লোকেদের সহিত একজোট হইয়া তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বসিয়াছিল! তাঁহার এতবড় করুণার সমুচিত গৌরব করা দূরে থাক, তাহাতে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে না করিয়া উল্টাইয়া তাঁহার কার্য্যকে বাড়াবাড়ি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, বাধা দিতে গিয়াছে, স্বামী বাধা মানেন নাই বলিয়া নিজেকে তাহাতে হতমান বোধে অভিমান করিয়াছে। মাগো! এমন নীচু মনটা তাহার কি করিয়া হইল? নিজের ইতিহাস-খানা তখন মন হইতে মুছিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? যদি তাহার এই উচ্চহৃদয় স্বামীর মধ্যে এত বড় দরিদ্র-প্রীতি না থাকিত, তবে এই যে আজ রাণী পরিমলকুমারী মিত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিতা হইয়া সহরের বুকের মাঝখানে হীরকদ্যুতির মতই ঝলমল করিতেছেন, এ কোথা হইতে হইত? আজ সে দরিদ্র ভিখারীর প্রতি স্বামীর অতটুকু সহৃদয়তাকে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া সিঁটকাইতেছে, আর যেদিন সেই ব্যক্তি নিজের সামাজিক পদ-প্রতিষ্ঠা, রূপ যৌবন ও অতুল ঐশ্বর্য্য—জাগতিক এই সমস্ত অতুলৈশ্বর্য্যকে—তুচ্ছ করিয়া দিয়া, শত শত রাজা, জমিদার এবং বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর প্রলোভনীয় উপহার সমেত পরী, অপ্সরী মেয়েদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই

ভিখারিণীকে নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার সেই অনন্যসাধারণ অদ্ভুত কার্য্যটাকে কতই না বাড়াবাড়ি বলিয়া কতলোকেই না ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল!—সেই কথা মনে করিতেই পরিমলের সমস্ত মুখখানা সহসা টক্‌টকে লাল হইয়া গিয়া গাল দুইটা তাহার গরম হইয়া উঠিল। স্বামীর একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া সে তাহার বুকের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া সলজ্জঅনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "বেশ করেছ ওকে এনেছ, তুমি কার না কবে ভাল করে থাক! তা ওরা যদি চলে যায় যাগ্‌গে,—আমি নিজে হাতেই সব কাজ করবো।"

নরেশ প্রীত হইয়া স্ত্রীর মুখখানা দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহচক্ষে চাহিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এই তো মানুষের মতন কথা! ভয় দেখিয়ে কেউ অন্যায় করিয়ে নেবে কেন?"

অন্য একসময় পরিমল স্বামীকে কাছে পাইয়া যেন নিজের পূর্ব্বকৃত অবহেলা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উঁহাকে একটুখানি খুসী করিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিরঞ্জন একটু সেরে উঠ্‌চে?"

নরেশ কহিলেন "হাঁ অনেকটা, তবে লোকটার স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে কি না, শীঘ্র যে বেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে সে আশা মোটেই নেই।"

পরিমল একটু সহানুভূতি দেখাইয়া আবার কহিল "ওরা বলে ওর মুখটা নাকি পুড়ে গেছে? কি করে গেল—আহা!"

নরেশ কহিলেন, "কি করে গেল সে কথা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেম, দেখলেম, ওসব বিষয়ে কিছুই সে বল্‌তে চায় না। পূর্ব্বকথা কোন কিছু উঠে পড়্‌লেই একেবারে চুপ হয়ে যায়, কাজেই আমিও আর জান্‌বার জন্য বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করিনি। যাই হোক, কোন রকম ভয়ানক দৈব দুর্ঘটনা যে ওর উপর দিয়ে ঘটে গেছে, আর তার ফলেই যে ওর আজ

ওই ভিখারীর অবস্থা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! লোকটাকে আজ আমরা যা দেখ্‌ছি ও ঠিক তা নয়!"

পরিমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল "সে আবার কি?"

নরেশচন্দ্র ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন "সত্যি পরি, লোকটা বেশ বিদ্বান ছিল —'ছিল' বল্‌চি তার কারণ, এখন ওর মাথাটা ঠিক সহজ অবস্থায় নেই,—কেমন যেন একটা টলমলে ভাব। বেশী দুর্ব্বলতা, কি বেশী শোক বা রোগ, অথবা ঐ আগুনে পোড়া,—এই রকম কোন কিছুতে ওর শরীরের সঙ্গে ভিতরটাকেও ঠিক অমনি করেই দিয়েছে। যেমন শরীরেরও কোন কোন অংশে পূর্ব্বেকার সৌন্দর্য্য,ভগ্নস্তূপের অন্তরালে সূর্য্যরশ্মির মত উঁকি মারচে;—মনের মধ্যেও ঠিক তেমনি অবস্থা। সেখানেও অর্দ্ধ-সম্মোহ অর্দ্ধ-বিকলতার মধ্যে মধ্যে এমন একটা উচ্চশিক্ষার আভাষ দেখতে পাচ্চি যে, আমিতো আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কত সময় মনে হয় যেন কোন অভিশপ্ত ঋষি, কি রাজা, কি এমনিধারাই কোন একটা বড় লোক, ভাল লোক, আজ দুর্দ্দশার চরমে পড়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে; তাই ওকে সরিয়ে দিতে আমার মন সরে না।"

বলিতে বলিতে ভাবপ্রবণ নরেশচন্দ্রের সমস্ত মুখটা যেন চকচকে হইয়া উঠিল, দুই চোখে সহানুভূতির বাষ্প জমিয়া উঠিল, এবং কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বামীর এই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অকৃত্রিম করুণার উচ্ছ্বাসে পরিমলের মনের মধ্যেও একটা সহানুভূতির দমকা হাওয়া জোরে বহাইয়া দিল। শুনিতে শুনিতে সহসা তাহার সুকোমল নারীচিত্ত স্নেহে বিগলিত বিমথিত হইয়া তাহার দুই চোখ করুণার অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিল এবং কখন যে তাহা তাহার সুপুষ্ট গণ্ড বহিয়া সূত্রচ্ছিন্ন মুক্তার ন্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া তাহারই কোলের উপরে পড়িতে লাগিল, সে বিষয়ে তাহার কোন হিসাবই রহিল না। মনে মনে সে স্বামীর বিশ্বাসের সমর্থন করিয়া

নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে, এবার হইতে সেও এই বিরাট-গৃহপ্রবাসী পাণ্ডববৎ-অজ্ঞাতপরিচয় লোকটীর প্রতি অবিচার হইতে দিবে না, নিজেও করিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি-ঝরি,—আঁখিজল,

—তীর্থরেণু

এর পর হইতে নিরঞ্জনের একটু একটু করিয়া কপাল ফিরিল। কর্ত্তার প্রিয়পাত্র হওয়ার অপরাধে সে বেচারার ঔষধ, পথ্য, সেবা কিছুই সমুচিতরূপে জুটিত না. এখন কর্ত্রীর স্নেহলাভ ঘটিয়া, তাঁহার খোঁজখবর লওয়ার গুণে সে বেচারা রাজভৃত্যবর্গের হাত এড়াইয়া কিছু কিছু সত্য সত্য ঔষধ-পথ্য লাভ করিতে থাকায় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সহজেই শরীরে বল পাইতে লাগিল। এমনই করিয়া কিছুদিন গেলে, একদিন নরেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বলিল "এখন তো আমি সেরে উঠেছি, আজ্ঞা করেন তো এবার যাই।"

নরেশচন্দ্রের মুখে একটা সুগন্ধি সিগারে আগুন জ্বলিতেছিল, সজোরে সেটাতে একটা টান দিয়া, সেটাকে দুই অঙ্গুলি মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া, মুখ মধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি বাহিরে মিশাইয়া দিয়া, তিনি ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার একটুখানি যে উষ্মা জাগিয়াছিল, তাহা ঐ নিষ্প্রভ মধ্যাহ্নসূর্য্যে ত্রিপাদগ্রাসী গ্রহণ লাগারই ন্যায় প্রভাহীন মুখখানার প্রতি চাহিতেই ক্ষণমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল; তথাপি হয়ত একটু কঠিনস্বরেই বাহির হইয়া গেল.—"কেন, এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?"

কথাটা বোধ হয় শ্রোতার পক্ষে একটু বেশীই কঠিন হইয়া থাকিবে। কারণ, ইহা কাণে যাইবামাত্র সে যেন বেত্রাহতের মতই চমকাইয়া এক

পা পিছাইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দিবার শক্তিই বোধ করি তাহার রহিল না। স্বল্পপরে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া যখন কি বলিতে গেল, ততক্ষণে নরেশচন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজেই লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া উহাতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সেটা শোধরাইয়া লইলেন। তিনি সদয়কণ্ঠেই কহিলেন "আমার বাড়ীর চাকরগুলো বুঝি আবার তোমার সঙ্গে লাগতে আরম্ভ করেচ? বদমায়েসের ধাড়ী সব!"—

নিরঞ্জন কহিল "তাদের কোন দোষ নেই।—"

নরেশ কহিলেন, "তবে কা'দের আছে শুনি।"

মৃদু অপরাধীভাবে নিরঞ্জন পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলা দুষ্কর বুঝিয়াও বলিয়া ফেলিল, "চিরদিনই কি আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো?"

নরেশ পুনশ্চ ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে কি করবে শুনি?"

কি করিবে? কই এ কথা নিরঞ্জন একবারটিও ভাবিবার আবশ্যক বোধ করে নাই? কি করিব? কেমন করিয়া চলিবে? এই যে সব অতি সহজ প্রশ্ন, সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ লোকগুলার মনের ভিতর যে সবের তোলাপাড়া অহোরহই চলিতেছে, এই লোকটার মনের খাতার পাতা হইতে ঠিক ঐ কথাটাই যেন আজ বহুদিন যাবৎ নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল। এই সোজা সরল প্রশ্নটাই যে সে নিজের মনের কাছে কোন মতে আর উত্থাপন করিতে পারে না,—এমন কি, অপরে করিলেও যেন কতকটা ভীত হয়। কিন্তু নরেশ-চন্দ্রের এই কথাটারই বলিবার ভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে সে যেন আজ একটু-খানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল। যে কথার উত্তরে পুঁজি তাহার নাই, তাহারই জন্য বৃথা চেষ্টা সে করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেশচন্দ্র একটু শ্লেষের ভাবে কহিলেন;

"আবার সেই রাস্তার ধারে গিয়া পড়ে পড়ে মরবার প্রতীক্ষা করবে বোধ হয়?"

তারপর ইহাতেও কোন উত্তর আদায় করিতে না পারিয়া একটু উত্তেজিত বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন "বলি পরের সাহায্য নিতে এতই যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা'হলে একটা চাকরী বাকরী করলেও তো হয়। 'গলগ্রহ' হবার দরকারই বা হ'তে যায় কেন?"—

নিরঞ্জন এবার কথা কহিল, বলিল,—"দু"একবার চাকরী করেছিলেম,—মধ্যে মধ্যে আমার মাথার ঠিক থাকে না কিনা, একবার সেই অবস্থায় যে আফিসে কাজ করতেম তার কি কাগজপত্র নাকি নষ্ট করে ফেলি, তাতেই তারা বিদায় করে দেয়। আরও একবার একটি উকিলের মুহুরীর কাজ পেয়েছিলাম; কিসে নষ্ট হয়—তা ঠিক মনে নেই, হয়ত বেশী অসুখ করেছিল, কারণ যখন থেকে মনে আছে তখন আমি হাঁসপাতালে ছিলাম।"

এই উত্তর পাইয়া নরেশ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, তারপর হাত দিয়া অদূরবর্ত্তী বাগানের একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন "এসো, ঐখানে বসে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।"—এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে আসন লইয়া পুরাতন আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, "আচ্ছা শেষ চাকরী যে করেছিলে সে কতদিন হ'লো?"

নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিয়া উঁহার কথার উত্তর দিল "মনে হয় যেন একবৎসর পাঁচ মাস পূর্ব্বে।"

"এই একবৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে আর কোন কর্ম্ম কাজই করোনি?"

নিরঞ্জন নিরুত্তর রহিল। পরে কহিল, "পাগলা গারদের হাঁসপাতালে

মাস এগার থাকিবার পর সেখান থেকে বেরিয়ে চেষ্টা অনেক করেছিলেম, আমার এই চেহারা; এই স্বাস্থ্য, এ দেখে সহজে কেউ চাকরী দিতেই চায় না। ও চুটীও যে পেয়েছিলেম সেও অনেক কষ্টে।"

নরেশচন্দ্রের পূর্ব্ব-বিরক্তির সবটাই যেন এক মুহূর্ত্তে ঘোরতর অনুতপ্ত লজ্জায় গলিয়া পড়িয়া জল হইয়া গেল, নিজের হাত দিয়া ক্ষতচিহ্নিত শীর্ণ একখানা হাত সযত্নে ধরিয়া স্নেহকরুণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আমি তোমায় যদি চাকরি দিই ? তা'হলে তো তুমি আর 'যাই যাই' করবে না ?—তারপর তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া সোৎসাহে কহিলেন, "আর ইতস্ততঃ করো না ; সেই বেশ হবে, কেমন না ?"

নিরঞ্জন যুক্তকর নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়া গাঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ তাই যাওয়ার কথা তুলেছিলেম। আপনার সেবা চিরদিন ধরে আমার আপনা হ'তেই যে করতে চাওয়া উচিত ছিল।"

এই উত্তরে নরেশচন্দ্র একেবারে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই শিশুর মত সু-উচ্চ হাস্য ধ্বনিতে, পার্শ্ববর্ত্তী ঝুম্‌কালতার বিতান মধ্যে যে একটা পালিত হরিণ কচি ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিবিষ্ট ছিল সেটা চকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তিনি ইহা আমলেই না আনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দেখ ভাই নিরঞ্জন ! এখন ওসব একটা ফ্যাসান উঠেছে বটে, আর অনেক গ্রাজুয়েট দোকানদার,—গ্রাজুয়েট কুলির কথাও শোনা গেছে ;—কিন্তু গ্রাজুয়েট সেবক নিয়ে আমি তো ভাই মারাই যাব। নাঃ ! ওসব সেবা টেবার কথা নয়। তার চেয়েও একটা বড় শক্ত কাজে আমি তোমায় জুড়ে দেবো মনে করেছি। দেখ, তখন কিন্তু মনে মনে আমায় গাল দিও না ভাই,—"

নিরঞ্জনের স্বাভাবিক ম্লান ও বিমর্ষ মুখে ঈষৎ হাসির তড়িৎ চমকিয়া

গেল। সে কহিল, "আমায় আপনি যা করাবেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।"

নরেশচন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, "দেখা যাবে নিরু, সেখানে অনেক বড় বড় হাতি তলিয়ে গেছে সে বড় বিষম ঠাঁই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবৈভব, হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে ;
কখন তোমার, কখন আমার স্থির নয় কারো ঘরে।

—তীর্থরেণু

নিরঞ্জন এ বাড়ীতে থাকিয়া গেল। শুধু থাকাই নয়—বাড়ীর আশ্রিত হিসাবে নহে,—কর্ম্মচারী হিসাবে যে রহিল সে সংবাদটাও উহ্য রহিল না। তা এ সমাচারটা গোপন না থাকাই শুভফলপ্রদ হইয়াছিল। যতক্ষণ কপর্দ্দকহীন ভিখারী নিরঞ্জন এই সুবিপুল রাজবাটীর একটি প্রান্তে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, ততক্ষণই তাহার ঔষধপথ্য সেবার সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পাইয়াছে। কিন্তু এখন তো আর সেই দীনাতিদীনাবস্থা নিরঞ্জনের থাকিতেছে না, তাই সংসার ক্ষেত্রেও তাহার মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট হিসাবে স্থির হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে তেমন করিয়া অযত্ন অগ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা নিশ্চিত! কারণ এখন হইতে তাহার কাছে মাস কাবারে মাঝে মাঝে বখশিষ চাহিলে পাওয়া যাইতে না পারে এমনও নয়। অবশ্যক অনাবশ্যকে দু-এক টাকা কর্জ্জ লইয়া সুদ তো নয়ই, শোধও না দিলে চলিয়া যায়।—ইত্যাদিরূপ অনেক সুঁযোগ পাওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গতই বা এমন কি? বামুন ঠাকুরের দল প্রথম এই খবরটা শুনিয়া দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে নাসিকা অনেক উচ্চে তুলিয়া প্রচলিত ছড়া কাটিয়া—'যত ছিল নেড়া-বুনে, সবাই হলো কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খত্তাল।'—ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গহাস্তে রান্না-মহলটা ফাটাইতে চাহিলেও—পূর্ব্বোক্ত যুক্তি গুলি মাথায় ঢুকিয়া শীঘ্রই তাহাদের পাকা মন্ত্রীর মত গম্ভীর করিয়া আনিল।

হারাধন বলিল, "তা যাই বল, আর যাই কও সর্ব্ব-ঠাকুর, মুখ পোড়াটা এদিকে লোকটা ভাল আছে, ওটাকে হাতে রাখতে পারলে মন্দ হ'তো না।"

অমনি সকলকারই মাথায় চট্ করিয়া ফন্দিটা খাটিয়া গেল। সর্ব্ব-ঠাকুর হারাধনের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্‌রে হারু, পোড়ামুখোটা হাঁদা গোছের আছে, কে জানে ওটার অমন পাতা চাপা কপাল! ভিক্ষে করতে এসে যে সভাপণ্ডিত হয়ে বসবে তা'কি ছাই জানি, তাহলে কি গোড়া থেকে অমন করে তুচ্ছ করতে যাই? আহাহা, বড় ভুলটাই হয়ে গেছেরে! এখন যে হাতে কামড়াতে ইচ্ছে করচে!"

হারাধন মুখ সিটকাইয়া কহিল, "বামনাই বুদ্ধি এম্‌নিই বটে! তুচ্ছ করেচি তো হয়েচে কি? আজ থেকে অ-তুচ্ছ করতে লেগে যাওনা কেন! ওর যদি অত কথার হুঁস থাকবে, তাহলে পাতে বসে তিনটে বেরালে ভাগ বসায়? দেখতে পাওনা কি রকম যেন আলাভোলা।"

সর্ব্ব-ঠাকুর নরসুন্দর-নন্দনের এ যুক্তিটাকেও সমীচীন বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "তা বটে! তা হ্যাঁরে হারু, ও মানুষকে আবার রাজাবাবু কি চাকরী দেবে বল্ দেখি? ওই তো রূপ আর ওই তো বুদ্ধি!"

হারাধনের পূর্ব্বেই বাবুর খাস খানসামা ইহাদের চেয়ে পুরাতন দলের সাতকড়ের সেখানে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, এবং তাহার কর্ণেও সর্ব্বঠাকুরের শেষ প্রশ্ন ও মন্তব্যটা প্রবেশ করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তীব্রব্যঙ্গে ইহার একটা উত্তরও দিয়া দিল, বলিল—"আমাদের রাজা সাহেবের ভাত পেটে পড়্‌লে, অনেকেরই পোড়া রূপ তাজা হয়ে ওঠে; সে তোরা না দেখে থাকিস্ না দেখতে পারিস; এই সাতকড়ের সে সবই দেখা

আছেরে! অনেক জানোয়ার আছে না, যারা উঁচুতে উঠ্‌তে পেলেও, তাদের নজর উপরের দিকে উঠতে চায় না?—জানিস্ না আমাদের মুনিবেরও যে ঠিক সেই দশা!"

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষরূপ তীব্র ইঙ্গিত নিহিত ছিল. সে তত্বের সন্ধান এ বাড়ীর চাকর দাসীদের কাহারও কাছেই অজ্ঞাত নয়, তা সে যতই নূতন আগন্তুক হোক না কেন। তা সেই কথাটা স্মরণ করিয়া সকলেই তখন একটু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া লইল।

রান্নাঘরের ঝি পেঁচোর মা বলিল, "ঠিক বলেছিসরে সেতো! একটা বাক্যির মতন বাক্যি বার করেছিস্!—সত্যি—বলি, বড়লোক তুমি, বড়লোকের মতন রুচি পিরবিত্তি হয় না কেনে? দেখেওচি আর শুনেওচি কত বড় বড় লোক রূপসী-রূপসী মেয়ে নিয়ে দোরে বসে হত্যে দিয়েছে, তা সে সব তখন চক্ষের কোণ তুলেও চেয়ে দেখলে না, একটা কোথাকার বাইজী না কি, মোছলমান না য়িহুদী তাকেই নিয়ে মাথার মণি করে রাখলে। তারই জন্যে ঘর বাড়ী, সোনাদানা, গাড়ী, পাল্কি, কি ছিষ্টি! তা সেও নয় বুঝলুম বাপু বড় লোকের ছেলেদের অমন হয়ে থাকে, তা ওতে তাদের অত দোষ হয় না। ভগবান ভোগ করতে দিয়েচেন, করবে না?—তা হয় তাই নিয়েই থাক, না হয় ও যা আছে তা আছে, ওরই সঙ্গে একটা বড়দেখে জমিদার রাজা টাজার ঘর থেকে বউ করে নিয়ে আয়, যে পাঁচজনে দেখে শুনে ধন্যি ধন্যি করুক। পাঁচটা তত্ব তাবাস আসুক যাক্, কুটুম্বু-সাক্ষেৎ আনাগোনা করুক। আমরাও গরীব দুঃখী লোক—দুটো পয়সার পেত্যেশ করেই না এসেছি এই বড় মান্‌ষের দোরে, তা পাই না হয় টাকাটা সিকেটা! ওমা, এ কোথাকার একটা পথেকুড়ুনো ধুম্বধাড়ী কালো মেয়ে ধরে এনে কি না তাকেই একেবারে

রাজ্যিপাটে বসিয়ে দিলে। ঘুঁটেকুঁড়ুনী হলেন পাটরাণী। আবাক্ কাণ্ড মা ?"

সকলেই এই সুমন্তব্যে মুখ মুচকিয়া হাসিল।

সাতকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই আবার অবাক কা'ণ্ডর দেখলি কিরে মাগি! যে অমন করে গালে হাত দিয়ে বস্‌লি? সে যদি কেউ দেখে থাকেতো সে এই ঘোষের পো সাতকড়ে।—বলি তাহলে শোন;—সে এক অজ পাড়াগাঁ, চারিদিকে তার জঙ্গল আর জঙ্গল. দিনের বেলা সেথাকার জঙ্গলে হুয়া হুয়া করে শেয়াল ডাকে, রেতের বেলায় প্রাণটা হাতে নিয়ে পিদ্দীমটী সামনে করে সারারাতটি জেগে কাটাতে হয়, কি না কখন বাঘ এসে ঘাড়ের রক্তটুকু না চুমুক মেরে চুসে খেয়ে যায়! একতাল্লা কাচারী বাড়ীর ভাঙ্গা চোরা দরজা গুলো ভররাত নেকড়ের বাচ্চারা এসে ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ করে নাড়া দিয়ে যাচ্চে বাব্বাঃ! সে কি দেশ, না সে দেশে কোন ভদ্দর নোকের ছেলেয় পা দেয়? তা আমাদের বাবুর সকলি কি না বিপরীত কাণ্ড!—ওঁয়ার বাপ পিতেমোদেরও বোধ করি ওঁয়ারই মতন রুচি পিরবিত্তি ছিল, তাই সেই দেশে গেছলেন তারা জায়গা জমি কিনতে।—তা ভাই, তাই বা বল্‌বো কি বল্? শুনেচি নাকি—সেখানের একটা বুড় প্রজার মুখেই আমার শোনা—ওঁয়ার ঠাকুদ্দা নাকি বড্ডই গরীব ছিল, ওই অঞ্চলেরই কোন্ এক বড় লোকের বাড়ী নাকি সে গোমস্তাগিরি করে খেতো। তারপর ওরই হাত দিয়ে কি রকম করে গোলমাল হয়ে নাকি তাদের ওই সব জমিদারী লাটে চড়ে যায়, আর বেনামীতে ও নিজেই নাকি সেই সব কিনে টিনে নেয়। এত বড় অধম্মে লোক ওরা!"

শ্রোতৃবৃন্দ মহোৎসাহে সাতকড়ির বর্ণিত মনিব কুলের কুৎস শুনিতেছিল। শ্রোতাদলের মধ্য হইতে পেঁচোর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা

করিয়া উঠিল, "তা হ্যাঁগা, ওদের সেই জমিদার মুনিবের কি হলো গা? তারা বোধ করি খুব গরীব হয়ে গেল? তাদের এখন কে আছে গা?"

"শোন একবার ন্যাকা মাগীর ন্যাকামী কথা! তাদের কে আছে, তারা কি খায়, গাছতলায় শুতো কি কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছিলো—সে-সব ফিরিস্তি নাকি আমার কাছে তারা দাখিল করে দিয়ে গেছে! আমি তার কি জানি রে বাপু? গরীব তারা অব্বািশ্য হলো বই কি! তবে খেতে না পেয়ে মরেই গেল, কি কম সম খেয়ে জ্যান্ত রইলো, সে ইতিহাসের পুঁথিটা আমার পড়া নেই। এদের কথাটাই সেই 'শেয়াল রাজার' দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম তাই তোদের কাছে বল্লুম, দেখিস্ ভাই, যেন কারু কাছে গল্প করে বেড়াতে যাসনে সব! যে তোরা কাণপাতলা নোক বাপু, একটা কথাতো কারুর পেটেই থাকে না!—ওই যে ছোট দিকের একটা টান আছে না, তোরাও তো ঐ কথাই বল্‌ছিলি কিনা—তা সেটা এলো কোত্থেকে, সেই কথাটাই তোদের শুনিয়ে দিলুম বুঝ্‌লি? কিন্তু খবরদার পাঁচকাণ যেন না হয়।"

কথার সুরে এবং চাহনির মধ্য দিয়া মনিব বংশের হীন রুচি সম্বন্ধীয় অনেকখানি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া চারিদিকের হাস্য-কৌতুকের সহিত যোগ দিয়া উঠিয়াই সাতকড়ি তাহাদের শুনিবারও বটে, আবার নিজের বলিবার আগ্রহেও বটে পূর্ব্বকথিত কাহিনীর অ-কথিত অংশটা পুনরারম্ভ করিল;—

"হ্যাঁ তারপর, হ্যাঁ দেখগে কি বলেগে বলছিলুম কি না—সেই তো দেশ, তা সে অঞ্চলে ওর ঠাকুর্দ্দা যখন জমিদার হয়, তখন ওদের আমদানি নাকি এর সিকির সিকিও ছিল না ও দিকটা তখন আরও বন বাদাড় ছিল কিনা, যাকে বলে সেই 'অজাগরবিজ' বন।

তা'ছাড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলা ছিল, খানিকটে নাকি নদীর গর্ভে ডুবেই ছিল। ওদের কপালগুনো বড্ডই জোয়ালো কিনা, হঠাৎ দুটো নদীর স্রোত ফিরে গেল,—একটা বেঁকে এসে ওদের জমীদারীর পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেল, তাতে নাকি একদিকে ঢের আবাদী জমির সৃষ্টি হলো, আর একদিকে বড় বড় সেগুন গাছের চালানের ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আর একটা নদীর জন্যেও কি সব সুযোগ পাওয়ায় জায়গায় জায়গায় বন আবাদ করে লোক বসিয়ে গাঁ সব তৈরি হলো, এই করে নাকি যেখানে দু'হাজার ছিল সেখানে ছত্রিশ হাজার টাকা আয় দাঁড়ালো। এমনি করে করে ক্রমেই আরও কত বেড়ে উঠেচে তা কে জানে? শুন্‌তে পাই দুলাখ টাকারও উপরে। যাই হোক বেশীর ভাগ জমিদারের জমীদারীই নাকি এই রকমের। শুনেচি ওদের মধ্যের কেউ কেউ নাকি আগে ডাকাত পুষেচে, কেউ মনিব ঠকিয়েচে, কেউ কেউ সরকারকে বড় বড় রাজস্বলুঠের সাহায্য করে নিজেরা বড় মানুষ হয়ে গেছে। তা এদেরই বা শুধু শুধু দুষ্‌লে হবে কেন? আবার সেদিন সরকার মশাই বল্‌ছেল যে, এখন আবার অনেকে পুলিশে গোয়েন্দাগিরি করে, খুনীর হাতে খুন হয়ে বউ ছেলেকে জমিদার করেও নাকি দিয়ে যাচ্চে! সংসারে কত রকমই যে আছে।"

ইতিমধ্যে বাসনমাজা ঝি মোহিনীর অভ্যুদয় হইয়াছিল. সে মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করিল "আহা! সাতকড়ি আমাদের কত সবই না জানে!"

পেঁচোরমা এই আকস্মিক রসভঙ্গে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া তাহার পেঁচার মত চোক দুইটা তেমনি করিয়াই পাকাইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল "ভদ্দর লোকের সঙ্গে সঙ্গে চারটে কালই দেশ বিদেশে ঘুরচে, ও না জান্‌বেই বা কেন্ লা? নে' দাদা সাতু, তুই ওসব কথায় কাণ দিস্‌নে, ভাই, বলে যা, যা বল্‌ছিলি। তারপর?—"

মোহিনী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার তুলিল "আ গেল যা, একটা কথার কথা মাত্তর কয়েচি, না মাগি অমনি আগুনখাকীর মতন যেন ছুটে মারতে এলো! বলি সাতকড়িকে বলেচি তো তোর অত গায়ের জ্বালা হলো কেন বল্‌তো? কেন তোর একলার সাতকড়ি নাকি যে কারুর একটা ভালমন্দ কথা কইবার যো নেই, অমনি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়?"

তখন আর যায় কোথা? রণহুঙ্কার দিয়া প্রায় "যুদ্ধং দেহি" ভাবে ফিরিয়া পেঁচোর মা দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল "আমর মাগি! গতরের মাথা খেয়ে শুধু শুধু কিনা গায়ে পড়ে এলো আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে! আচ্ছা আয় তবে একবার ভাল করে দেখে নিচ্চি, কতবড় তুই, আর কতবড় তোর মুখ, আয় একবার আজ দেখচি তোকে—"

অদূর হইতে একটা হাঁক আসিল, "সাতকড়ি! রাজাবাবু তোমায় শীগ্‌গির করে ডাকচেন।"

নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখটা করিয়া সাতকড়িও হাঁকিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে এই যাচ্চি—" কোন্দল-পরায়ণাদের দিকে চাহিয়া একটু দুঃখিতভাবে কহিয়া গেল, "নিজেদের দোষেই তোরা গল্পটা শেষ কর্‌তে দিলিনি, তা নাদি'গে যা, মরগে যা দুটাতে খাওয়া খাওয়ি করে, এর পর সাতদিন খোসামোদ না করি'য়ে তো আর বল্‌বো না।"

এই বলিয়া সে প্রস্থিত হইল।

পিছন হইতে কোপরুদ্ধঝঙ্কারে মোহিনী চেঁচাইয়া কহিল, "বল্‌বিনি তো সেই ভয়ে আমি মরে রইলুম আর কি! কি তোর এমন মহাভারত না ভাগবত যে সে না কাণে গেলে নরকে পচে মরে থাকবো? খোসামোদ যে করতে জানে সে-ই ভাল করে করবে এখন; আমার

যদি খোসামোদ করা জানতুম রে, তা হলে তোর কেন, তোর মুনিবেরই করতুম। ছেরকালটা ধরে না শীত, না গ্রীষ্মী বাসন মেজে মেজে মরতুম না রে!"

পেঁচোর মা দুই পাকান চোখে মোহিনীকে ভস্ম করিবার মত আগুন ভরিয়া খোঁপাখোলা এলোচুল আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দাঁত কিড়মিড় করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—"দেখ্ মোহী আবাগী! অমন করে ভাল মানুষদের পেছনে লাগিস্নে বল্‌চি! কেন, আমি কি তোর বুকে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি নাকি, যে যখন তখন তুই আমায় ঠোক্কর মেরে কথা কইতে আসিস্?"

নিরঞ্জনের চাকরী হইয়াছে সে খবর এবাড়ীর বাসিন্দারা এবং যাহারা এ সংসারের সহিত আসা যাওয়া করিত তাহারা সকলেই জানিল বটে; কিন্তু কি চাকরী যে তাহার হইল, সে খবরটায় যেমন তাহারা পাঁচজনে,—তেমনি নিরঞ্জন নিজে শুদ্ধ অজ্ঞই রহিয়া গেল এবং তা অমন প্রায় দিন পনেরই এই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া কাটিল। চাকরী পাইয়া নিরঞ্জনের মনটা একটুখানি প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু ফলে দেখা গেল, চাকরীর মধ্যে যথাপূর্ব্বই সেই আশ্রয়দাতার বাড়ীর নীচের তলার একটী এই বিশেষ ঘরের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট বিছানাটায় পড়িয়া পড়িয়া অফুরন্ত দুঃখময় চিন্তা-স্রোতের মধ্যে ভাসিয়া যাওয়া অথবা সেই ঘরের কড়িকাঠ কয়খানার হিসাব রাখা,—এ ভিন্ন তো কই তাহার কর্ম্ম-জীবনের কোন সফলতাই দেখা দিল না। আরও দুইচারি দিন অপেক্ষা করিয়া করিয়া একদিন নরেশচন্দ্রের নাগাল পাইয়া সে সসঙ্কোচে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় তো কোন কাজই দেওয়া হ'ল না?"

নরেশ তখন কি কাজে তাঁহার স্বভাবজাত অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন; তাহাতেই মগ্ন থাকিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না,

দুদিনেই সংসারের কর্ম্ম-স্রোতে ভাঁটা পড়ে যাবে না, কাজ ঠিক থাকবে।”

নিরঞ্জন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিতে গিয়া আবার বন্ধ করিয়া ফেলিল। কি জানি বেশী পীড়ন করিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে হয়ত সেটা আদায় হওয়া অধিকতর দুর্ঘট হইয়া পড়াও নেহাৎ বিচিত্র নয়! বাবুর যে মেজাজের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে আর যতই ভাল জিনিষ থাক না কেন, একটা যে খেয়ালের খেলাও তার অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, সেটাও নিতান্ত অস্পষ্ট নহে। কেহ জোর করিয়া 'হাঁ' বলিলে তাঁহাকে প্রায়ই তেম্‌নি জিদের সঙ্গে 'না' বলিতে বাধ্য করা হয়, অতএব যেখানে আগ্রহ অধিক সেখানে অনাগ্রহেই কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিছু সম্ভব বটে।

সে নীরবে ফিরিতেছিল, নরেশ ডাকিলেন “ওহে নিরঞ্জন শোন, শোন.—”

নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশ একতাড়া কাগজ দেখাইয়া কহিলেন “আমার এই পিপড়ের ঠ্যাং লেখাগুলোকে বুঝে নিয়ে এর একটা “ফেয়ার কপি” করতে পারবে?”

হারানিধি বা ওম্‌নি কিছু কুড়াইয়া পাইলে মানুষের মুখের যে ভাব হয়, ঠিক তেমনিতর হর্ষোৎফুল্লমুখে নিরঞ্জন তাহার স্বাভাবিক অবসাদ-পূর্ণ শিথিল গতিকে যৌবনোদ্যমপরিপূর্ণ আগ্রহচঞ্চল করিয়া একরকম ছোঁ মারিয়াই যেন নরেশের হাত হইতে সেই কোণ-গাঁথা ফুলস্কেপ কাগজগুলা কাড়িয়া লইল এবং সাগ্রহে তদুপরি নিজের নিষ্প্রভনেত্রের ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে যে হস্তাক্ষর লিখিত ছিল তাহাকে কদর্য্য বলিলেও খুব মিথ্যা কথা বলা হয় না। এ বিষয়ে নরেশের মন্তব্যটাকে 'বিনয়' বলিয়া ভ্রম করিবার কিছুমাত্র কারণই বিদ্যমান

নাই। কিন্তু বহুকালের অনাবৃষ্টির পর সামান্য এক পশলা জলেও যেমন প্রকৃতির সমস্ত ম্লানতা ধুইয়া গিয়া তাহাকে চিক্কণ ও শ্যামল দেখায়, নিরঞ্জনেরও সেইরূপ কর্ম্মবন্ধনবিহীন ছন্নছাড়া জীবনের সমুদয় এলো-মেলো গ্রন্থিগুলা যেন এতটুকু কাজের নাগাল পাওয়াতেই একটি ক্ষণের ভিতরে সংযত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিল। সে আর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই একখানা চৌকি লইয়া বসিয়া সাদা কাগজ কয়খানা টানিয়া লইল।

সেদিন অপরাহ্নে পরিমল যখন তার বৈকালিক বেশভূষা সমাধা করিয়া আনিয়াছে, তেমন সময়ে তাহার নিজস্ব দাসী অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। পরিমল আসিয়া দেখিল নরেশ কয়েকখানা বই হাতে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"কি এ গুলো? নতুন কোন গল্পের বই বেরিয়েছে বুঝি? তা বাঁধানর এমন ছিরি কেন?"—বলিয়া উহারই একখানা টানিয়া লইয়াই পরিমল ঠোঁট উল্টাইল—"ও হরি! আবার এই মাথা মুণ্ডু নিয়ে আসা হয়েছে? আমিতো বলেইছি যে এ সব আর আমার দ্বারা হচ্চে টচ্চে না। মাগো, বুড়ো হয়ে মর্ত্তে যাচ্চি এখনও কি না রয়েল রিডার নম্বর থার্ড পড়া!"।

নরেশচন্দ্র হাসিলেন"ওর চেয়ে যে আর ওপোরে উঠতে পারলে না সৈ! আমার কি সাধ যে চারকাল ধরেই তুমি কচি খুকির পড়া পড়? না, এবার এই রাজকীয় "পঠনা"র গণ্ডী তোমায় পার হতেই হবে, পরি!"

পরিমল বই কয়খানা সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর প্রশস্ত স্থূল স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া আবদার করিয়া বলিল "ও আমি আর পড়বো না।"

"কেন পরি?"

"বুড়ো বয়েসে আর অতো শেখা যায় না। দেখলে তো পারলুম না।"

নরেশ বলিলেন "দেখ তা'যদি বলো, তাহলে আমি হাজারটা উদাহরণ দিয়ে, দেখিয়ে দিতে পারি যে বুড় বয়েসে সামান্য একটু লেখাপড়া শেখা সে তো কিচ্ছুই নয়, একেবারে আগা থেকে পান্তলা পর্য্যন্ত বিবি বনে যেতে পারা যায়।"

পরিমল স্বামীর কথায় হাসিয়া ফেলিল, তারপর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বিষণ্ণস্বরে কহিল, "তারা বোধ হয় আমার মতন পাড়াগেঁয়ে গরীব ঘরের মেয়ে নয়, তাই পারে।"

নরেশ কহিলেন "তা'নয় পরি, ও তুমি একেবারে ভুল করলে। আজ পাড়াগেঁয়ের ছেলে মেয়েরা সহরে এলে যত বদ্ধ সহুরে হয়ে ওঠে, সহরের বুকের মধ্যে সাতপুরুষে বাস করে থেকেও তার সিকি-টুকুও পারা যায় না। সংক্রামক রোগের মধ্যে সর্ব্বদা যারা বাস করে, তাদের চাইতে বাইরের লোকদেরই সংক্রামিত হওয়ার ভয় বেশী কিনা। যাক্ ও সব তর্কাতর্কি তুলে রেখে দাও, তোমায় আমি এম্-এ, বি-এল পাশ করে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীর দরখাস্ত পাঠাইতেও অনুরোধ করছিনে, আর বিলাত ঘুরতেও নিয়ে যাচ্চিনে;—মাত্র খামের উপর চিঠির ঠিকানাটা লেখা, বা ছোটছেলে মেয়েদের অক্ষর পরিচয়টা করাবার মতন পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত না রাখলে চলবে কেন বলতো? এতটুকু চাওয়ারও কি আমার যোগ্যতা নাই?"

পরিমলের গাল দুটি ঈষৎ একটু রাঙ্গা হইয়া আসিল, নতমুখে সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "চিঠি লেখবার তো আমার অনেকই আছে। আর ছোটছেলে—তা যদি ঈশ্বর আমাদের দেন, তাদের শেখাবার লোকের এ বাড়ীতে কোন অভাব হবে না।"

আহা; ঐখানেই যে তোমাদের গলদ পরি! মা বাপের কাছে

শিক্ষা না পেলে সন্তানের যে প্রকৃত শিক্ষাই হতে পারে না। প্রথম থেকে মাইনে করা মাষ্টার গবর্ণেসের ব্যবস্থার মতন ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা আর কিছুতেই নেই। বিদ্যালাভটাও একেবারেই তাতে তাদের পক্ষে বিস্বাদ হয়ে যায়। মায়ের আদরের সঙ্গে মিশিয়ে অতি সহজ খেলার মতন যেটা শিখে ফেলে, একজন অপরিচিতের শাসন গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কি সে বস্তু পেতে পারে তারা কখনও ?"

পরিমল কিছু ক্ষুণ্ণচিত্তে জবাব দিল, "একটু আধটু শিখ্‌ছি তো, কিন্তু ও ইংরাজী বইটাই আমার পড়তে মোটে স্থবিধে হয় না। মনেই থাকে না যে ছাই।—আর কি বিশ্রী উচ্চারণ ও বানান! সে যাক,—হাঁ্যাগা, আজ আমায় পার্সী থিয়েটারে নিয়ে যাবে? 'মোহন-মুরলী' দেখে আসবো।"

নরেশ স্ত্রীটীকে একটু সন্তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করাই সুযুক্তি বোধে সেদিন ঐ পর্য্যন্তই থামিয়া গিয়া জবাব দিলেন, "বেশতো, যেও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়
তার সনে যদি তোমার মনের নাহি থাকে পরিচয়
আচরণ-তার বিচার করিতে যেওনা যেওনা তবে,
তুমি যাহা ভাবে কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে,
হয়ত সে রণে তুমি হেরে যেতে, সে তবু হয়েছে জয়ী,
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি।

—তীর্থরেণু

দু'চারজন বন্ধু আসিয়া একটা পুরাতন দাবী দিয়া সেদিন নরেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল "ওহে রাজা! তুমি এতবড় ফাঁকিবাজ হয়ে উঠ্‌লে কেমন করেই বলোতো?"

নরেশ তাদের দাবী বুঝিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকিয়া চাপা বিরক্তির মন্দ হাস্তের মধ্যে জবাব দিলেন, "কেন, চা দিতে বল্‌তে দেরী হয়েছে বুঝি? ওরে সাতকড়ে!—"

নলিনবিহারী নামে নরেশের এটর্ণী বন্ধুটী মুখ বিকৃত করিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিয়া উঠিলেন, "এইও! খবরদার! একেবারেই বোকা বোনো না! চায়ের তেষ্টা আর সরভাজা রাজভোগের ক্ষিধে নিয়েই আমরা রাজ-দরবারে ভোজের আরজি পেস করাতে আসিনি হে! যে কথা আমাদের দিয়েছিলে সেইটে রাখ্‌ছো কবে তাই এখন বলো দেখিনি, শুনি?"

নরেশ যেন একেবারে আসমান হইতেই পড়িয়া দুইচোখ বিস্ফারিত করিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন,—"কথা দিয়েছিলুম; অথচ রাখিনি—এমন তো কিছুই আমার মনে পড়ে না! "জোচ্চোর", "গাধা" প্রভৃতি অনেক মিষ্টি মিষ্টি বচন তো আমায় শোনালে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে দুটো

আইস্‌ক্রিম্ আর খান ডুচ্চার করে খাস্তা কচুরির সঙ্গে ছানার জিলিপি খেয়ে যাও দিকিন, রাণী-সাহেবার খাস তৈরি। খাসা হয়েছে!—"

সাতকড়ি হাজির ছিল, বাবুদের জন্য জলখাবারের ফরমায়েসের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিধনঠাকুর্দ্দা ডাকিয়া বলিলেন,"হারুকে আমার হুঁকোটা ফিরিয়ে একছিলিম দিয়ে যেতে বলে যাস্ বাবা!"

নলিন নরেশের বাক্‌চাতুর্য্যে কিছুমাত্র ভুলে নাই, অসন্তোষের সহিত বলিল,—"সুয়োরাণীর খাস মহল তোমার খাসা রকম বজায় থাক,আমাদের সেথায় কিছুমাত্র ভাগ চাইনে ভাই! দুয়োর দুয়োরটা এখনও যে অত করে চেপে রেখে কেনই দিয়েছ, সেইটে শুধু আমাদের মতন নিরেট বোকাদের বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে, সেইটুকুই একটু বুঝতেচাই!—এদিকে তো খবর পাচ্ছি যে মধু-বাসর সম্পন্ন করে ফেরা অবধি এই তিন বৎসরে দুঃখিনী দুয়োরাণী একেবারেই মহারাজের চক্ষুঃশূল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখ দর্শনও নাকি আর ভ্রমক্রমেও করা হয় না,—অথচ তাঁকেও দেবে না নরলোকের মুখ দর্শন করতে। এতো তোমার বিষম জুলুম দেখতে পাই! কিন্তু আর সেটী হচ্চে না! আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে এই যে খোসামোদ করে করে মরচি, একটি দিনের জন্যও যদি অপ্সরীর গলার একটা গানও শোনাতে তাহ'লেও নয় বোঝা যেত যে কথার তোমার কিছু ঠিক আছে, আরে ছোঃ!"

ননীবাবু নলিনকে চোখ টিপিয়া নিজেই তার হইয়া দরবার করিতে আসিল,—"আঃ থামো না নলিন! অত ব্যস্ত কেন? আমার ছাত্রীর গান শোনবার জন্যে তুমি অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়েছ বটে; তা সুবিধে হলেই রাজা তোমায় কি আর না শোনাবেন? সত্যি রাজা! অত করেই যে সুষমাকে সঙ্গীত বিদ্যেটা আমরা শেখালুম, তা সে যদি এমনি করে সব ছেড়েই দেয়, তাহ'লে অনর্থকই উভয়তঃ এতটা পরিশ্রম করে কি ফলটা হলো বল তো? আগেকার মতন কখন-সখন,—এই

আমাদের ক'জনার মধ্যেই সে যদি একটু আধটু গাইতে টাইতে নাই পেলে তাহলে তারই বা বারমাস একঘেয়ে বন্দীজীবন ভাল লাগে কি করে? এই তিনটে বচ্ছর তো আমি বা ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত তার ওখানে গেলে ঢুকৃতে পাইনে। তা ভাই, ছেলে মানুষের প্রতি এতটা কড়াকড়ি কি করাই তোমার উচিত ?"

ঠাকুরর্দ্দা হুঁকার নলে মুখ দিয়ে একমনে টানিতে টানিতে একবারটি মুখ তুলিয়া ছোট্ট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে মানুষের পক্ষে বাঁধনটা বড্ড বেশী কড়া হয়ে পড়েছে বই কি! অল্প একটু ঢিলে দিলে হয় ভাল— অ—ল্প একটু।"

নরেশ এবার ব্যথিত বিশাল চক্ষু উত্তোলনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সহচরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিয়া উঠিলেন "আপনিও যোগ দিলেন ?—"

তাঁহার কণ্ঠে অবিচারিতের সুদৃঢ় অভিমান ব্যক্ত হইল।

হরিধন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া গুন্‌গুন্ করিয়া বলিলেন —"আরে, না'রে. দাদা ভাই! তা' আমি বলচিনি. সুষমা যে কত ভাল মেয়ে সে আমি সবই জানি বই কি! তবে কিনা,—তবে কিনা এতটা বিদ্যে যে শিখেছে;—এই তোমারই বন্ধুবান্ধবের কাছে তোমারই সাক্ষাতে বসে দুটো গেয়ে শোনালে তাতে দোষটা কি? সেই কথাই আমি বলেছি ভাই! ওরা যে আমায় শুদ্ধ খেয়ে ফেলে। বলে তুমি তার ওস্তাদ, তোমার কি তার উপর কোনই দাবী দাওয়া নেই? তা' আমি আর কি বলবো দাদু? তাই—"

নরেশ বন্ধুদের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া জবাব দিলেন—"আপনি সাফ বলবেন যে তা' আপনার নেই,—তা' হ'লে আপনাকে আর কেউ জ্বালাবে না।"

শুনিয়া তবুও নলিন মুখরভাবে কহিয়া উঠিল,—"যদি পুরাতন প্রেম

ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমজালে,'—তা হ'লে তাকে বিদায় দিলেই পারো। তা'বলে একটা নিরীহ জীবের উপর এতটা অত্যাচারও সহ্য করা যায় না! বলি আমাদের ঘরে তো আর নূতনের আমদানী হয়নি।"

নরেশের দুই চোখ রাঙ্গা হইয়া তাঁর কপালের শিরা সাপের মতন মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তাঁর সমস্ত শরীরেই যেন একটা প্রবল রকমের টান পড়িয়া তাঁহার দুই হাতের মুঠা কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল;—কিন্তু তার পরও যখন তিনি অচল অটল হইয়া নিজের আসনেই বসিয়া রহিলেন, তখন দেখা গেল, মনের মধ্যের একটা অদম্য উত্তেজনার স্রোতকে সংহত করিয়া রাখিতে, তাঁহাকে তাঁর সঘনে কম্পিত বিবর্ণ অধরকে দাঁত দিয়া চাপিতে হইয়াছে।

বন্ধুবরেরা পরস্পরে দৃষ্টির ইঙ্গিতে পরস্পরকে নিজেদের হতাশার খবরটা দিয়া চুকিল; কিন্তু একান্ত লোভাতুর নলিনবিহারীর এততেও মন মানিল না, সে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিয়া ফেলিল—"তা'হলে আমাদের গান শোনানের আশা যে দিয়ে আসছিলে সেটা শুধু ছেলে ভুলোনর মতন সম্পূর্ণই---"

নরেশ ইহার পাদ পূরণ করিলেন—"অলীক।"

"তা হলে আশা পূর্ণ হবে না?"

নরেশ চোখের দৃষ্টি তাঁর সাম্‌নাসাম্‌নি সোজাদিকে ঠিক্ রাখিয়া শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"না"।

"গোড়া থেকে বল্লেই হতো।"

"বলেছিলুম অনেকবার, তোমরা সেকথা শুনতে চাও কই?"

"তুমি বলেছিলে,—সে আমাদের সামনে গাইবে না। কিন্তু ডাক্তার, ননী—এরা সব বল্লে যে, তুমি হুকুমে কল্লেই সে গাইতে পথ পাবে না; সে তোমায় নাকি যমের মতন ভয় করে।"

"আমি বল্‌বো না।"

"এ সোজা কথা।"

বন্ধুরা বিদায় লইবার পূর্ব্বে আর একটা খোঁচা দিয়া গেল।

"ওহে রাজা! তোমার সেই জাম্বুবান মন্ত্রীটী গেল কোথায়? শুন্‌ছিলুম সে নাকি তোমার বাড়ীতেই রয়েছে।"

নরেশ কহিলেন,—"আছে বই কি; তাকে যে আমি চাকরী দিয়ে রেখেছি। খাসা ছেলে সে!"

সব ক'জনেরই চোখে মুখে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি উথলিয়া উঠিল।

"কোন কাজে বাহাল হলেন, বাছাধন?"

নরেশ ভৎর্সনার ভাবে চোখ ফিরাইয়া অথচ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আমার স্ত্রীর মাষ্টার করে দিচ্ছি যে তাকে।"

"তা'হলে তো কায়েমী বন্দোবস্তই হয়েছে! কিন্তু দেখ' ভাই। ছেলে মানুষ যেন অন্ধকারে ও শ্রীমূর্ত্তি দেখে আঁৎকে না ওঠেন।"

বন্ধুরা বিদায় হইলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মন লইয়া নরেশ স্ত্রীর খোঁজে উপরে উঠিলেন। তাহাদের বিদ্বিষ্ট ও বিদ্রূপবাক্যই তাঁহার উভয় সঙ্কল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিল।

পরিমল তখন চুল-বাঁধুনীর কাছে পরিপাটী সিঁথিপাটী করিয়া কেশ রচনা করাইতে ছিল। আশে পাশে আয়না, চিরুণী, গন্ধ তৈল, ভিজা গামছা, আরও কত কি ছড়ান। পিছনে বসিয়া সোণার তাগা পরা, হাতখালি, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা আন্নাকালী সাতগুছির চ্যাটা বিনাইতে বিনাইতে বাগবাজারের রায়েদের বাড়ীর বৌ-ঝিয়েদের সৌখীনত্বের শত শত উদাহরণ জমা করিয়া দিতেছিল! পরিমল উৎকর্ণ হইয়া সে সকল মুখরোচক কাহিনী গোগ্রাসে গ্রাস করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রশ্নও করিতেছিল; যথা—"হ্যাঁগা, তাদের বৌর'

বিকেল বেলায় বার মাসই বেনারসী বোম্বাই সাড়ী এই সব পরে থাকে? কোন দিনই কি বাদ দেয় না?”

আন্নাকালী বলিল “না ভাই, তারা ও সব রোজই পরে। তা'পরবে নাই বা কেন বলো না? পয়সার তো তাদের কমি নেই। অন্ন লোকেদের যেমন আটপৌরে কলের সাড়ি কেনা হয় না; তেমনি তাদের যে গাদা করে করে ওই সবই কেনা হয়ে থাকে ভাই! তা' তুমিও কেন বিকেল বেলা একখানি করে পাতলা বেনারসী, পার্সি, কি জামদানী ঢাকাই পরো না বৌদি! তোমারও তো রাজার ইশ্বর্য্যি, কিসেরই বা কোন্ অভাবটা?”

পরিমলের কাঁচা মনে এই সকল অনাস্বাদিত সুখের প্রবাহ প্রলো-ভনের ঘনো জাল বিস্তার করিতেছিল। তথাপি সে ঈষৎ বিজড়িতভাবে কহিল, “আমার কি ওসব পরে থাকলে মানায়? লোকে হয়তো হাসিবে, বলবে ‘কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ!’

প্রসাধনকারিণী অবাক্ অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, হাসবে না, বলে ইয়ে করবে! কেন তুমি কি সেওড়া গাছের পেত্নী নাকি যে তোমার গায়ে কিচ্ছুই মানায় না? রংটাই তোমার যা শাম্‌লা। মুখের কাট টাট্ কেমত দিব্যি! চুলটী পিট ঝাঁপা, মুখখানিও তো তোমার আমি খাসা দেখি ভাই! তা' ভাই, বলবোই বা কি! পয়সা হলেই তো আর রূপ কিনে আনা যায় না। বড় বড় লোকের ঘরে কটাই বা সুন্দর আছে? যত সব ধনীর ঘরে, দেখবে সবার অঙ্গেই প্রায় ধার করা রূপ, সাবানে-পাউডারে, বিলিতি-রং, খড়ির গুঁড়ো, সুর্‌মা, ভুরু আঁকিবার পেন্‌সিলের টানে—আর হীরে মতি জরি সিলিক, তার উপরে ইলেকট্রিকের আলোর ঝিলিক্ আছে। তুমিও ভাই দেখ না, আমার হাতে যখন পড়েছ দু'মাসের মধ্যে তোমায় গৌরবর্ণ না করে কি আর

ছাড়বো মনে করেচ? ওই আপ্‌টানটী ভাই। কিন্তু দুটীবেলা ভাল করে লাগানো চাই। তোমার ও সাবান ফাবানের কর্ম্ম নয়—"

এমন সময় অন্নদা দাসী আসিয়া খবর দিল, "রাজা বাবু শীগ্‌গির করে একবার আপনাকে ডাক্‌ছেন।—"

দুই দিকে দুইটা বিনুনী ঝুলাইয়া অসমাপ্ত বেশ-ভূষায় পরিমল স্বামি সন্দর্শনে ছুটিল। মন অবশ্য এই অ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখা দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিল বইকি। আহা, সেই আসিলেনই যদি আর একটু পরে আসিলেই যে বেশ হইত।

নরেশ বেশী কিছু ভূমিকা না করিয়াই সোজা কথায় বলিয়া গেলেন "দেখ পরি! মিসেস্ বসুর কাছে পড়া শোনা তোমার তেমন তো কিছুই এগুচ্ছে না, তাই ভাবছি তাঁর বদলে যদি একজন মাষ্টার ঠিক করা যায় তো কেমন হয়?"

পরিমল তার বিনুনী শুদ্ধ মাথাটী সবেগে নাড়া দিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, সে একটুও ভাল হয় না। কেন, মিসেস্ বসু তোমার কি কর্‌লেন শুনি?"

নরেশ হাসিয়া কহিলেন,- "ভয়ে কবো না নির্ভয়ে?"

"তা নির্ভয়ে বল্‌তে পারো।"

"তিনি আমার পাড়াগাঁয়ের নিরাড়ম্বর সাদা সিদে পরিমলকে সহরের 'ডানা কাটা' পরীদের পাশে দাঁড় করাবার বন্দোবস্তে আছেন,—এভিন্ন আর কিছুই নয়।"

পরিমল বেণী দুলাইয়া বাঁকা চোখে অভিমানের বাণ হানিল,— 'ডানা কাটা' পরী' যদি আমি হতে পারতুম, তাহ'লে কিনা ও সব খোঁটা আমায় তুমি দিতে পারতে? কি আমি করেছি বাপু? ভাল ভাল সাড়ী জ্যাকেট গহনাপত্র অত অত সব আমায় কিনে দাও কেন? না দিলে তো আর আমি পরতে যেতুম না।"

নরেশ সস্মিতমুখে তার নাকটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন—"আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করিলেই পারো। যাক্ ওসব কথা নয়।—তুমি জানো লেখা পড়া শেখাটা আমার পছন্দ। শুধু বিলিতি বিবিদের বেশ ভূষাকেই অনুকরণ করলে চল্‌বে নাতো, তাদের সদ্‌গুণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। তা' ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিনকালে মূর্খ থাকতেন না। বই পড়া কম থাকলেও এবং নাথাক্‌লেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সেকালের মেয়েদের অপর্য্যাপ্তই ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সবই ত্যাগ করচো, শিখে নিচ্চো শুধু বিলিতি বিলাস সুখ টুকুই। তা করোনা, বড় আশা করে তোমায় নিয়েছি যে আমার সন্তানেরা যেন নির্ম্মল ও নিখুঁত মা পায়, তাদের তা পেতে দিও, পরি!"

পরিমল মুখটা খুবই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

নরেশ আবার বলিলেন,—"যাহোক, আমি যা বল্‌তে এসেছি সেটা শুনে নাও; নিরঞ্জন তো কাজের জন্য বড্ডই ব্যস্ত করচে। তারই কাছে যদি তুমি খানিকটা করে পড়ো সে মন্দ হয় না। বেচারা ভারি ভদ্রলোক। লেখা পড়াও বোধ হয় জানে এক রকম।—"

পরিমল ঘোরতর অপছন্দের সঙ্গে প্রবলবেগে আপত্তি তুলিয়া বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই বাধা দিল—"বল কি তুমি ওই মুখ-পোড়াটার কাছে আমায় পড়তে হবে! কক্ষোনো না, কক্ষোনো না।—ওর কাছে আমি কিছুতেই পড়ব না। মাগো ওটা বাঁদর কি মানুষ তারই যে কিচ্ছু ঠিক নেই।"

একটা প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাস নরেশের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। আরক্ত মুখে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"পরিমল! ওকথা মুখ দিয়ে বল্‌তে তোমার লজ্জা হলো না? কেমন করে বল্‌লে তুমি? এই তোমার' উপরে আমার ভবিষ্যৎ বংশের জন্য আমায় উচ্চ

আশা পোষণ কর্‌তে হয়েছে! যাকে আজ অত ঘৃণা দেখালে, কেমন করে জান্‌লে যে সেই লোক একদিন খুবই সুপুরুষ ছিল না? তোমাদের মতন রূপযৌবনগর্ব্বিতা সুন্দরীদের কারুকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েই যে ওর ওদশা হয়নি. তাই কি তুমি জোর করে কিছু বল্‌তে পার? সে হবে না—ওরই কাছে তোমায় প'ড়তে হবে। কাঁদ্‌ছো, কান্নায় শুধু অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।..."

বন্ধুদের ব্যবহারে পূর্ব্বাবধিই যে বিরক্তি মনের মধ্যে এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় সংঘর্ষে তাহা বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়া অসন্তোষের কালিমাচ্ছন্ন ললাট ও গম্ভীর মুখ লইয়া নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখনও এখনও মন সে নামে শিহরে কেন ?

—অশ্রুমতী

সেই নকল করা কাগজ ক'খানি হাতে করিয়া নিরঞ্জন যখন নরেশচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁহার পাঠাগারের দ্বার দেশ হইতে গৃহোদ্যানের সবুজ ঘাসওয়ালা জমির ধার পর্য্যন্ত পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহাকে যেন কোন নূতন মানুষ বলিয়াই ভ্রম হইতে পারিত। বাহিরের চেহারা অবশ্য বদলাইয়া যাইবার কোন উপায়ই ছিল না, মুখের একটা দিক গভীর ক্ষত চিহ্নে প্রায় গহ্বরের মতই গভীর হইয়া গিয়াছে, সে দিকের রংটাও যেন কালির মত কালো, বাকী সবটুকুও বসন্ত ক্ষতের হস্তে এমনই নির্ম্মমভাবে অত্যাচারিত, যে সেখানে নাক চোখ প্রভৃতি আর যে কিছু আছে, তাও ঠাহর করিয়া বুঝিতে হয়।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য বদলাইয়া গিয়াছিল তাহার ভিতরটা! প্রসন্ন স্মিতহাস্যে সমস্ত মুখখানা তাহার যেন বৈশাখী ঝড়ের শেষে চাঁদের আলোর রেখাটুকুর মতই স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। মূর্চ্ছাতুর অন্তরের সমুদায় নিদ্রিত বৃত্তিগুলি সহসা যেন কার যাদুযষ্টির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত আনন্দে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, "তবে তো আমরা মরি নাই রে, মরি নাই!"

নরেশ ঘোর অসন্তুষ্টমনে নীচে নামিয়া আসিতেই নিরঞ্জনের হাতের বাণ্ডিলটার উপর নজর পড়িয়া গেল।—

"কি, পেরে উঠলে না বোধ হয়? সে তো আমি তোমায় গোড়াগুড়িই বলে দিয়েছিলুম"—বলিতে বলিতেই তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। মনটা তাঁহার প্রথম দফায় বন্ধুবর্গ ও দ্বিতীয় দফে স্ত্রীর

উপর বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই উভয় মনোবাদের প্রধানতম ও মূলীভূত কারণ নিরঞ্জনকেও তাই বেশ মধুর মনে হইল না।

কিন্তু নিরঞ্জন বেচারা সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া, সে নিজের মনের গভীর আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া একমুখ হাসির সহিত কথা কহিয়া উঠিল; বলিল—"পারবো না কেন? আপনার লেখা তা'বলে অতদুর মন্দ নয়।" এই বলিয়া সে অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা কয়েকখানি কোণগাঁথা কাগজ নরেশচন্দ্রের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সেই লেখাটার উপর নজর পড়িতেই নরেশচন্দ্র যেন আকস্মিক দণ্ডাহতের মতন চমকাইয়া উঠিলেন। এ লেখা!—একি তাঁহার পরিচিত?—বড় পরিচিত নয় কি? দুই মুহূর্ত্তেরও অধিককাল স্তব্ধ বিস্মিত দুই নেত্র স্থির করিয়া তিনি সেই কাগজগুলার উপর চাহিয়া রহিলেন। এ লেখা কা'র? কোন পুরাতন দিনের সুখ-স্মৃতি জালে জড়িত হইয়া এর প্রত্যেকটী অক্ষরের ছবি তাঁহার মনোদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত রহিয়াছে! কিন্তু এ যাহার প্রতিবিম্ব, তার আসল রূপটুকু কোথায়? কা'র হস্তাক্ষর এ? এত পরিচিত, এত আপনার বলিয়া যাহাকে দেখিয়া চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ জলধিবৎ অন্তর তাঁহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে সে কা'র হাতের লেখা?—কিছুই স্মরণে আসিল না।

মুখ তুলিতেই একটি সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল। নরেশের দৃষ্টি গম্ভীর এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কই, না, এ মুখ, এ যে তাঁহার চিরদিনেরই অচেনা। অন্তরের কোণে কানাচে খুঁজিয়া কোথাও তো এর ছায়াটুকুও ভাসিয়া থাকিতে দেখা গেল না! তবে এই হাতেরই লেখা এমন পরিচিত সন্দেহ হয় কিসে? শুধুই এটা অমূলক সংশয়ই নয় কি? না এর ভিত্তিমূল কোথাও কোন গভীর গহ্বরে নিহিত

আছে? কিছুক্ষণ চিন্তাকুল অস্বস্তচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে হাল-ছাড়াভাবে নরেশচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ—দৃষ্টির আঘাতে বিপন্নপ্রায় নিরঞ্জনের মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার তাহারই হস্তাক্ষরযুক্ত কাগজখানা দেখিলেন। তারপর হঠাৎ অসাধ্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহজভাব অবলম্বন করিয়াই সপ্রশংস ও সস্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন, "বাঃ বাঃ! ভারি সুন্দর তো হে, তোমার হাতের লেখাটী! আমার সেই কাগের ছানা বকের ছানাগুলি যেন মন্ত্রপূত হয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে দেখছি যে!"

নিরঞ্জন সপ্রীত-সলজ্জহাস্যে দৃষ্টি নামাইয়া কুণ্ঠিত-বিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কি কপি করবার আছে?"

নরেশ তাহার আগ্রহে অকস্মাৎ অত্যধিক উৎসাহিত হইয়াই উঠিলেন,—"কপি করবার সাধ যদি তোমার এতেও না মিটে থাকে নিরঞ্জন, তা'হলে ভাই তোমার কাছে কি কৃতজ্ঞই যে হয়ে থাকবে ঐ "কর্ণধার" প্রেসের কম্পোজিটারের দল, সে আর তোমায় কি বলবো! আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও না হয়ে উপায়ই নেই। যেহেতু ওদের কাছে গাল খেতে খেতে আমি দিনের মধ্যে কতবারই যে বিষম লেগে মরি। তার ওপরেও আবার আমায় দেখতে পেলেই ম্যানেজার মশাই ভীষণ তাড়া করে আসেন। প্রুফ দেখা,—সেও একটা মহামারী ব্যাপার; নিজের লেখা,—সে কি ছাই নিজেই বুঝতে পারি? সাধ করে কি আর এর আর এক রকমের ভয় ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে রবিবাবু বলেছেন,—

"অনেক লেখার অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করবো মোচন,
আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।"

কিন্তু সে তবুও বরং পদে আছে, নিজের লেখার প্রুফ তার চেয়েও যে ঢের বেশী শক্ত, সে হয়ত তাঁদের জানা নেই।”—বলিয়াই নরেশচন্দ্র হো হো করিয়া প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া ফেলিলেন।

নিরঞ্জন বলিল “তা’বলে আপনার হস্তাক্ষর অত কদর্য্য নয়; যাই হোক্ যখনই দরকার হবে আমাকে আপনার লেখা দেবেন; ‘ফেয়ার’ করে দেবো—”

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, “নিরঞ্জন! তুমি ইংরেজীও বেশ জানো, না? ওকি চুপ করে থাকলে কেন? বলোনা ভাই, ক্ষতি কি তাতে? আমি দেখেছি সে দিন তুমি লাইব্রেরী ঘরে বসে একটা কালো চামড়াবাঁধা কি বই পড়ছিলে, সে বইটা হয় ডিকেন্সের কোন নভেল, কিম্বা বায়রণের কিছু।”

নিরঞ্জন তাহার নত মুখখানা চকিতে তুলিয়া চাহিল। তাহার সে মুখে যেন আর রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। ম্লান ও শুভ্র অধর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত ব্যথিত বেদনায় আর্ত্তচোখে চাহিয়া থাকিয়া পরিশেষে সে যেন অস্ফুট বিলাপের ভাষায় কহিয়া উঠিল, “কি জানি. কেন আবার ওই সব জন্মান্তরের স্মৃতিগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে! মনে করেছিলুম, সবই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু ভস্ম করচে তা বোধ করি বা যায়নি—যায়নি—উঃ—” বলিয়াই সে এমন জোর করিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিল ও স্খলিত পদে পাশের দেওয়ালে দেহের ভর রাখিল, যে নরেশের বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে আর কিছুই বাকি থাকিল না যে, পূর্ব্বস্মৃতির মতন জ্বালাময় এ লোকটীর কাছে যেন তার সেই মুমূর্ষু নিঃসহায় অবস্থাটাও নয়। এইটেকেই সে যেন সব চেয়ে বেশী এড়াইয়া চলিতে চাহে বলিয়াই নিজেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল সম্বন্ধ হইতে উপড়াইয়া লইয়া

একেবারে রাস্তার ড্রেনের ধারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উঃ, না জানি কি সে ভীষণ অতীত—স্মৃতির মধ্যে যার এমন দহনশীলতা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে !
পূজার তরে হিয়া, উঠে যে উথলিয়া, পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে ?

—মানসী

বিবাহিত জীবনের এই কয়টা বৎসরে স্বামীর যে পরিচয় পরিমল পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে আর যতই না থাক একটা প্রচণ্ড জিদ যে ছিল ইহা নিঃসন্দেহ রূপেই সে জানিয়াছে। স্বামী তাহার সদানন্দ ভোলানাথ কিন্তু একটুখানি অবাধ্যতায় আবার তাঁর সেই সদাশিব রুদ্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইতে দেখা যায়। স্বামীর অসঙ্গত খামখেয়ালীর কথা মনে করিয়া পরিমলের মনটা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া বলিল, মানুষের সকল ইচ্ছা ও সকল কাজের উপর দখল লওয়া এ যে বিষম অত্যাচার ! উচিতের দিক্ দিয়া যতই দাবী করা যাক্ না কেন, মানুষ নিজেকে কোন অবস্থাতেই এমন ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না যে, আর একজনের প্রত্যেক খুঁটিনাটীর সকল আদেশকেই সে তার নিজের করিয়া লইতে পারে। অন্ততঃ হাসিমুখে যে পারে না, সেটা সে নিজেকে দিয়াই বুঝিত। নতুবা জুলুমের ভয়ে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রবল পক্ষের প্রচণ্ড ইচ্ছাস্রোতে মগ্ন করা, সে ত সংসারশুদ্ধ লোকে বাধ্য হইয়াই করিতেছে। পরিমল রাগ করিয়া অনেকক্ষণ বিছানার বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিল। অভিমান করিয়া মনে মনে আহত হইয়া ভাবিল, লোকে যে বলে সমানে সমানে না পড়লে কোন পক্ষেরই ঠিক মান থাকে না, তা ঠিকই। আমি গরীব অনাথা বলেই আমার উপর উনি সকল তা'তেই জবরদস্তি চালান। হতুম আমি

বাগবাজারের রায়েদের মেয়ে কি চো-গাঁয়ের জমিদার-রাজাদের কেউ, তা'হলে কক্ষণই আমার উপর এতটা জোর উনি চালাতে পারতেন না। আমি দুঃখী, আমার কেউ কোথাও নেই, মনে কষ্ট হ'লে যে একদিন বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখাব, তারও আমার উপায়টুক যে নেই সে জানেন কি না, তাই না আমায় সব কিছুতেই বাধ্য করতে সাহস করেন!"

পরিমলের দুঃখ যেন বুক তার ছাপাইয়া উঠিতে গেল। তারপর মুখ তুলিতেই হঠাৎ নজর পড়িল তাহার খাটের সাম্‌নাসাম্‌নি রক্ষিত কাপড়ের আলমারিটার আয়না আঁটা কবাটের উপর। দুচোখ ভরা জলের উপর আরও খানিকটা জলের আমদানী করিয়া সে সবেগে মুখখানা ফিরাইয়া লইল। তাই কি ছাই শরীরে তার খুব খানিকটা রূপই আছে! ওই যে বিধাতার পরম করুণার দান,—পার্থিব কোন কিছুরই বিনিময়ে যেটা ক্রয় করিবার উপায় নাই বলিয়া কত কত ধনী গৃহের বিলাসী মেয়েরা অসাধ্য সাধনার আরাধনায় সারাজন্ম ধরিয়া লাগিয়া আছেন এবং সম্পুর্ণরূপে সকলপ্রযত্ন হইতে না পারায় ভাগ্য ও তাহার নিয়ন্তাকে মনে মনে অভিশাপ দিতেও ত্রুটী করিতেছেন না,—পরিমলও সেই বস্তুটার অভাব আজ যেন বড় বেশী করিয়াই নিজের মধ্যে অনুভব করিল। এতদিন নিজের রূপহীনতার কথা মনে করিবার অবসরটুকুও তাহার ঘটে নাই বলিয়াই বোধ করি সেকথা তাহার মনে ছিল না। বরং ভোগে ও স্বাস্থে যে দরিদ্র জীবনের অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্য্য সে তাহার এই নবযৌবনোদ্ভাসিত নবজীবনে লাভ করিয়াছিল, তাহাই ছিল এতদিন তাহার কাছে পরমাশ্চর্য্যের মতই পরম বিস্ময়কর। কিন্তু আজ সেদিক দিয়া নহে, আর একটা দিক হইতে—অতিরিক্ত পাওয়ার গুরু বোঝার ভারটা যখন মাথার উপর বড় বিষম বলিয়া ঠেকিতেছিল, তখন নিঃস্ব দেনদার চারিদিকে হাতড়াইয়া ঋণশোধের একটা সিকি পয়সা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া

না পাইয়া ধনীর ঘরের লোহার সিন্দুকের দিকে তাকাইয়া মনেরমধ্যে তার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর স্বামীর চাইতেও বড় বেশী অভিমানী হইয়া উঠিল। সে এই বলিয়া তাঁহার দরবারে নালিশ রুজু করিয়া দিল যে, বড় লোকের মেয়ে, যাদের মা আছে, বাপ আছে, মা বাপের রাশিকরা টাকা আছে তারা কালো কুৎসিত হইলেও তাদের ভাল ঘরে বরে পড়িতে এতটুকুও আটকায় না যখন, তখন অনর্থক ও অ-দরকারে তাহাদের ঘাড়ে বাড়ার ভাগ—রূপের বোঝাগুলা না চাপাইয়া সেগুলা আমাদের মতন অধম, অক্ষম ও অভাগা জীবদের জন্য রাখা কি চলিত না? স্বামী যেমন দয়া করিয়া আমার পথের পাশ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছেন, তা আমার যদি একটুখানি রূপও এই দেহের মধ্যে থাকিত, তো না হয় তাই দেখিয়াই মনে মনে একটু গুমোরও রাখিতে পারিতাম যে, এই দেখিয়াই হয়ত তিনি আমায় নিজের করিতে পারিয়াছেন। তাঁর এই অগাধ দয়ার মূল্যে নিঃস্বত্বভাবে বিকাইয়া যাওয়া হইতে হয়ত বা তাহাতে আমি একটুখানিও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম! তিনি অত দিলেন,—একবারেই যে সমুদয়-টুকুই নিঃস্বার্থভাবে দিয়া ফেলিলেন, এর বদলে যে এতটুকু একটু কিছুও ফেরৎ পাইলেন না, এইখানেই যে মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগে। এইখানেই যে এই বিনামূল্যের কেনা বাঁদীরও অযোগ্যা যে, সে তাঁর দয়ার দামে বিকাইয়া যায়।—তাই অভিমান উথলানো বুকে পরিমল মনে মনে ভাবিল, যার জোরে পরাজিত দৈত্যের মেয়ে শচীদেবী ইন্দ্রের পাশে মাথা উঁচু করেই বসতে পেরেছিলেন, মৎস্যগন্ধা জেলের মেয়ে ভারত সম্রাটের মহিষী হতে লজ্জা পাননি, সেই রূপ থাক্‌লেও ত আমার একটুখানি মনের ইজ্জতও থাক্‌ত। আমার যে একেবারেই দয়া! দেবার তো আমার এতটুকু কিচ্ছুই নেই, কেবল বোঝা বেঁধে নেওয়া মাত্র, মান এতে থাক্‌বেই বা কিসে?—

রাগের মাথায় সে নরেশচন্দ্রের উদ্ভট দারিদ্র্য-প্রেমকে মনে মনে যৎপরোনাস্তি অপভাষা প্রয়োগ করিল। এমন কি অন্নদা দাসী. তাহার চুল বাঁধা যে তখনও সমাধা হয়ে উঠে নাই—এই বিস্মৃত সংবাদটা জানাইতে আসিলে, তাহারই সহিত সে এ বিষয়ে আলাপ করিতে বসিয়া জোর করিয়া বলিল "তাবলে কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি রকমের 'ভাল' হওয়াও মানুষের পক্ষে ভাল নয়। যা' রয় সয় সকল বিষয়ে সেই মতন চলাই সঙ্গত। গরীবকে দয়া দেখাতে হবে বলেই কি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করতে হবে নাকি ?"

অন্নদার সহিত যে তাহার মনিব-পত্নীর মতের এমন সামঞ্জস্যও আছে, ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদটা জানা থাকিলে আর সে বেচারা ইহার সম্বন্ধে বোধ করি পড়সীর বাড়ী বাড়ী গিয়া অনর্থক দশকথা প্রচার না করিয়া বেড়াইয়া তাঁহার সহিতই উহাদের সম্বন্ধীয় দু'চারিটা মুখরোচক আলোচনা ঘরে বসিয়াই সে চালাইতে পারিত। পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সে হাতমুখ নাড়িয়া মনিব-গৃহিণীর স্বপক্ষ সম্পূর্ণ সমর্থনপূর্ব্বক সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "ও মা. তা' আর বল্‌তে রাণীমা ! রাজাবাবুর আমাদের পছন্দর ছিরিই যদি থাক্‌বে তা'হলে আর আমাদের ভাবনাটাই বা কি ? এই দেখ না কত কত রাজা জমিদার হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌লে, তা' তানাদের পরী পরী সব মেয়ে ফেলে উনি কিনা কোন পাড়া'গাঁর মরুকগে, মুখে আগুন লাগুক আমার ! ওমা কি, কথা বল্‌তে কি বলি দেখ একবার ! এই জন্যই বলে গো, বুড়ো হলে বাহাত্তুরে ধরে যায়। কিছু মনে নিওনা মা ! কার সাম্‌নে যে কি কথা হচ্ছে, তোমার দিব্যি মা ; একেবারে নিজ্যুস্‌ ভুলে গেছি ! দ্যাও বাছা ! এখন চুলটো ফিরিয়ে দ্যাওসে, অবলার মা আটকে রয়েচে. তাকে আবার পাঁচ বাড়ী তো ঘুরতে হবে।"

পরিমল ঢিলটী মারিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটকেলটি খাইল, এবং খাইয়াই সে টুকু সে তৎক্ষণাৎ বুঝিল।

আশ্চর্য্য! এ'ও আবার মানুষকে কাণে ধরিয়া গালে চড় মারিয়া মনে পড়াইয়া দিতে হয়? 'রাজাবাবুর যদি পছন্দর শ্রীই থাকিবে' তবে বাগবাজারের চন্দ্ররায়ের সেজ মেয়ে সুন্দরী সাগরিকা, অথবা চোরবাগানের রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়ে সুখলালিতা সুধালতা আজ রাজা নরেশচন্দ্রের রাণী না হইয়া এই পথে কুড়ান কুরূপা পরিমল এই আসনে দখল লইল কেন? আজ একটা বসন্তক্ষত বিকৃত কদাকার ভিখারীর প্রতি সমাদরকে সে যে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, তাহাকে সে আদর দেখায় নাই বলিয়া তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করায় এই যে রাগে অভিমানে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছে, আর শত শত ধনী মানী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা সকলকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া নির্ব্বান্ধব এবং এমনকি পূর্ণ যৌবনে অশন বসনের অভাবে পরাশ্রিতা, অপরিচিতা এই যুবতীকে আপনি যাচিয়া বিবাহ করিয়া এই ধনীর দুলাল তাহাকে যেদিন ঘরে তুলিলেন, সেদিন তাঁর পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকার অধরে ও নেত্রপ্রান্তে কি ঘৃণা তাচ্ছিল্যের হাসি কি ক্রোধাভাষই না ব্যক্ত হইয়াছিল!—তা, সে কি তা জানেই না? মূর্খ তাতে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও এই অপরিচিত ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যময় নগর নিবাসে, এই খেতাবী রাজার রাজ-প্রাসাদে আনিতা হইবার পর হইতেই পদে পদে যে সেটাকে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। যখন আসিয়াছিল এ বাড়ীর দাসীচাকরদের শুদ্ধ নাকি তাহাকেও তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণালজ্জায় ধরণীগর্ভ প্রবেশেচ্ছা জন্মিতে ছাড়ে নাই, তা অন্যে পরে কা কথা! তার নিজের সংসারে আত্মীয়জন বেশী নাই। বৌ-ভাত উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে

সৎশাশুড়ী ও তাঁর মেয়ে অলকানন্দা এই দুজন মাত্র লোক এখানে আসিয়াছিলেন। সৎমা হইয়াও যে তিনি নরুর পাশে অমন বউ সহ্য করিতে পারেন নাই, এঠাও অকৃত্রিম সত্য সংবাদ। তিনিও নাকি গরীবেরই মেয়ে। চেলি-নন্দন ও ফুলের মালায় সাজাইয়া তাঁর গরীব বাপ তাঁহাকে লক্ষপতি গিরীশচন্দ্রের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের সময় তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু এক হিসাবে যে সেই নিঃস্ব গরীবের মেয়ে অনেক ধনাঢ্য কন্যাকে লজ্জা দিয়া দশের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, সে তাঁর অনবদ্য সৌন্দর্য্যের জোরে। সেই জিনিষটারই যে পরিমলের বিশেষ অভাব ঘটিয়া গিয়াছে। তাই ধনীর মেয়ে না হইয়াও যিনি রাজার মেয়ের মতই নিজের আনম্রিত রূপের গৌরবে, উচ্চ গ্রীবায়, বক্র কটাক্ষে, মাটির জগৎকে তাচ্ছিল্য-ভরে চাহিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁরও কঠিন নেত্রের অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে এই নিঃস্ব ভিখারিণী পরিমল ঘৃণা-লজ্জায় পলে পলে মাটিতে মিশিতে চাহিয়াছে। সে সব কথা ফিরিয়া ফিরিয়া আজ তাহার মনের বুকে ফুটিয়া থাকা কাঁটার মতই আবার খচ খচ করিয়া উঠিল। সেই সময়কার একদিনের মাতা-পুত্রের আলাপ দৈবাৎ তার কাণে যায়, সেই কথা কয়টা ব্যথার উপর তীক্ষ্ণ-প্রলেপের জ্বালার মতই স্মৃতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া তাঁর প্রায় সমবয়সী বিমাতা পদ্মাবতী অনুযোগ করিয়া বলিলেন "দেশে থেকেই শুনেছিলেম যে, তুমি এক চাটগেঁয়ে ধেড়ে মেয়ে কুড়িয়ে এনে এতবড় মিত্তির বাড়ীর বউ ক'রে দিচ্চো; কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে মেয়ের রূপের দিকটাতেও এমন কালিঢালা। এ কেলেঙ্কারী করার চাইতে তুমি এত দিন বিয়ে করবে না বলে যে পথ নিয়ে চল্‌ছিলে—সেও যে ছিল ভাল। সে তবু না হয় বোঝা যায়, এ যে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য!"

নরেশচন্দ্র এই ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটিমাত্র বর্ণও ব্যবহার করেন নাই।

সেদিনে কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা এত বড়ই হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাতে তাহার মনকে ধাক্কা দিতে পারে নাই, কিন্তু আজ এই গোপনীয় কথার সবটুকুই যখন জানা শুনা হইয়া গিয়াছে, তখন এত বড় অবমাননা-জনক তুলনাটা স্মরণে আনিয়া এবং এই লজ্জাকর অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বামীর মৌনভাবকে সম্মতিলক্ষণ বোধে তাহার বুকের মধ্যে অভিমানের তুমুল তরঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাঃ—ঠিক কথাই ঐ অন্নদা বলিয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রবৃত্তিই যদি নিম্নাভিমুখী না হইবে, তবে সেই বা আজ এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিতা কেন? রাগ করিবার কিছুইতো নাই। যা সত্য, তা অস্বীকার করিলেও সে মিথ্যা হয় না।

পরিমল নেহাৎই গরীব ঘরের মেয়ে। আবার শুধুই যে সে দরীদ্র কন্যা তাহাই যথেষ্ট নয়, এ সংসারে আত্মজন বলিতে তাহার কোন দিক দিয়া কোন বালাই ছিল না। তার উপর বাস তাহাদের সে এক কোন্ সুদূর উত্তরবঙ্গের অজ পাড়াগাঁয়ে। কলিকাতা সহর নিবাসী আধুনিক সভ্যতা ও নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অতুল ধন সম্পত্তির অপ্রতিহত অধিকারী খেতাবধারী 'রাজা' নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পত্নীপদ লাভ করিবার মত কোনই সুযোগ বা সামর্থ যে ঐ মেয়েকে বিধাতা বা মানুষে যে দান করে নাই, এ কথা একেবারে অবিসম্বাদী সত্য! তথাপি যে এমন অঘটনও ঘটিয়া গেল, এর জন্য ভদ্র ইতর নির্ব্বিশেষে সকলেই খামখেয়ালী বিশ্বনিয়ন্তা এবং তাঁহারই সৃষ্টিছাড়া-সৃষ্টিকরা তদপেক্ষারও খামখেয়ালী নরেশচন্দ্রকেই দায়ী করিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিত।

তা সামাজিক পদমর্য্যাদা বা ধনরাশি মণ্ডিত পিতামাতা না হয় নাই-থাক, শিক্ষিত সমাজে স্থান লাভের যোগ্য শিক্ষাদীক্ষাই কি ছাই

তাহার কিছু মাত্রও ছিল? বিদ্যার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অক্ষর পরিচয়টুকু আবশ্যক ঘটিয়াছিল, আর বুদ্ধির মধ্যে ভাত ডাল ও দু তিনটা সাধারণ ব্যঞ্জন রান্নার যতটুকু খরচ হয় সেই পর্য্যন্তই। তার পর রূপ,—তা সেটা তাহার নিজের দিক হতে বেশ স্পষ্ট করিয়া জানা নাই। কারণ সে যে বাড়ীর মেয়ে এবং যে সমাজের মানুষ, সেখানে আয়না ধরিয়া বসিয়া নিজের রূপের পরিমাপ করার সুবিধা বা প্রয়োজনই ছিল না। মা ছিলেন, স্নানের পর দিনান্তে একবার করিয়া চুলটা তিনি মোটা চিরুণীতে আঁচড়াইয়া একটা আঁটসাঁট শক্ত খোঁপায় বাঁধিয়া দিতেন, শেষের দিকে যখন তাহার রাজা-স্বামীর দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে; সে সময়টায় মা ছাড়িয়া রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধ কোন প্রাণীর সহিতই তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধের পাঠই উঠিয়া গিয়াছিল; এবং বাহিরের বা অন্তরের অবস্থাও তাহার পক্ষে এমনই প্রতিকূল যে স্বভাবতঃই নারীর সর্ব্বপ্রধান প্রযত্নে, ধন যে সৌন্দর্য্য তাহাকে রক্ষার চেষ্টা তো নহেই, পরন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে উহারই ধংস কামনাই তাহার চিত্তে তখন প্রবলতর। কাজেকাজেই তাহার প্রতি এই সুখ সৌভাগ্যসেবিত কমলাবাণীর বর পুত্রটির যে আকর্ষণ ইহার ভিতর রূপক মোহের এতটুকু কণামাত্রও যে স্থান ছিল না, এই কথাটা জোর গলাতেই বলা যায় এবং গুণগ্রাহীতারও কোন প্রমাণ সে সময়ে ত অন্ততঃ পাওয়া যায় নাই। কাজেকাজেই সেই সুদূর চট্টগ্রামের অশিক্ষিতা অত্যন্ত সাধারণ চেহারার দরিদ্রকন্যা তাহাতে একান্তই অসাহায়া অনাথাকে গ্রহণ করায় এ পক্ষ হইতে কাহারও কোন সহায়তা লওয়া হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ বলে নাকি শুদ্ধ মাত্র প্রবল অনুকম্পা ও উদারতাই নরেশ চন্দ্রের পত্নী নির্ব্বাচনের ঘটক হইয়াছিল, আবার কাহারও কাহারও

মতে নরেশের ঘাড়ে ভূতে ভর করিয়া তাহাকে এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্তি করিয়াছিল। পরিণত যৌবনে অসহায়া নারীর যে সকল আপদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাহারই বিড়ম্বনায় সে সময়ে এই পরগৃহবাসিনী পূর্ণ যৌবনা মেয়েটী একান্তই বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। মা মরার পর তাহার পূর্ব্বকার সকল ব্যবস্থাই কোন্ একটা দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ একেবারেই আগাগোড়া কাঁচিয়া যায়, যে নিরাপদ নীড়ে সে বাসা বাঁধিবার কল্পনা বহুদিন হইতেই তাহার সমস্ত অন্তকরণ দিয়া করিয়া আসিয়াছে, আকস্মিক একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের ঝাপটা আসিয়া তাহার সেই আশাতরীখানাকে হঠাৎ মাঝদরিয়ার মাঝখানেই বানচাল করিয়া দেয়, তারপর এই নিরালম্ব জীবন লইয়া সে আকুল-সাগরের ঢেউ খাইয়া খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কুল কোথাও পায় নাই। গ্রামের তাহারা নূতন বাসিন্দা, পুরাতন সুবাদ কাহারও সহিত ছিল না, আর থাকিলেও হিন্দুঘরের আইবুড় ধাড়ী মেয়ে যে কোন ভদ্রলোকে গলায় ঝুলাইবে, ততটা উদারতা পল্লীগ্রামে যখন ছিল সে অতীত যুগের কথা। কাজেই পরিমল স্রোতের ফুলের মত কেবলই ভাসিয়া বেড়াইতেই ছিল, কোথাও কুল পায় নাই। পূর্ব্বাশ্রয় যখন খসিয়া পড়িল ঘর বাড়ী ধন দৌলত সব কিছুই বেদখল যারা লইল, তারা শুধু তাহাকে বাদ দিয়া গেল, এই খবর শুনিয়া একজন প্রতিবেশী তাহাকে ঘরে স্থান দিলেন, সে সময়ে তাঁহার গৃহিণীটী সুতিকাগারে আবদ্ধ থাকায় নিজে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হইতেছিল. গৃহিণী এই অসহায়া মেয়েটীর খবরও নিয়া কর্ত্তাকে জানাইলে তিনি সহজেই সম্মত হইলেন ; কিন্তু মেয়েটি কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মধ্যরাত্রে কাঁদো কাঁদো হইয়া অস্পৃশ্য সুতিকাগৃহের আগড় ঠেলিয়া ব্যাধ-বিতাড়িতা হরিণীর মতই ছুটিয়া আসিল এবং গৃহিণীর

পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা আপনার বাড়ী বড় নিরাপদ মনে করেই ঢুকেছিলেম, কিন্তু বরং পথে পথে ভিক্ষা করে খাব, তবু এখানে আর থাকতে পারবো না, সকাল হলেই আমি চলে যাব।"

গৃহিণী নিজের ঘরের খবরে অনভিজ্ঞা নহেন; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাবে?"

পরিমল চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল "যে দিকে দুচোখ যায়।"

গৃহিণী কুণ্ঠিত মুখে কহিলেন "সে সবখানেই যে মন্দ লোকের কুদৃষ্টি নেই তাই বা কি করে জানবে মা? আমি বলি কি তার চাইতে নিজে একটু সাবধান হয়ে এইখানেতেই থাক। রাত্রে না হয় আমার কাছে এসেই শোবে, সকালে নদী-চান করে আসবে, আমারও বাছারা তবু সময় মতন দুটী ভাত পাবে, আর তোমারও—তা বাছা যে বয়েস তোমার তাতে এই নির্ব্বান্ধব অবস্থা এতে তোমার পক্ষে কোথায় যে ভয় নেই সেত আর বলা যায় না।"

পরিমল অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ও এই সংসারাভিজ্ঞা গৃহিণীটীর সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে মানিয়া লইতে সমর্থ হইল না। সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের আঘাতে তাহার অন্তরের মধ্যে আহত-নারীমর্য্যাদা তখন গুমরিয়া ফিরিতেছিল, সে নিঃশব্দেই উঠিয়া আসিল, এবং সেই বাড়ীতে দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইবার ভরসা না করিয়াই নিজের পূর্ব্বাশ্রয়েরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই তার বুকফাটান অতীতের সকলটুকু অসহ্য স্মৃতির মাঝখানকেও সে নিজের নারী মর্য্যাদা হানির বহু উর্দ্ধে বরণ করিয়া লইয়া কাঙ্গালের মতন কাঁদিয়া আসিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ঠিক সেই সময়টাতে নাকি ভাগ্যে ভাগ্যে সে বাড়ীর ঝি ছাড়িয়া যাওয়ার বড়ই গণ্ডগোল চলিতেছিল,

তাই এবার সেথানের আশ্রয় পাওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন হইল না। তবে বাড়ীর কর্ত্তা এইজন্য একটুখানি আপত্তি তুলিতে ছিলেন যে যদি এর পর এই আইবুড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ত কি হইবে? তবে এ আপত্তিটা তাঁর টিকিল না, যেহেতু বাটীর গৃহিনী বাসন মাজিতে তখন বেজায় নারাজ থাকায়, নথ ঘুরাইয়া ঐ যুক্তিটাকে এই বলিয়া খণ্ডন করিয়া দিলেন যে সেজন্য অত ভাবিতে হইবে না। সে তখন একটা ঝি জুটিলেই উহাকে কোন একটা অছিলায় দূর করিয়া দিলেই হইবে, এখনত দশদিন কাজ চালাইয়া দিক।" তা ঝি কিন্তু সেই দশদিনে পাওয়া গেল না এবং মাসকতকের পরেই একটা অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য কাণ্ডও ঘটিয়া গিয়া দেশশুদ্ধ লোককে একেবারে বজ্র স্তম্ভিত করিয়াছিল।

কলিকাতা অঞ্চলের একজন বড়লোক, ওই অঞ্চলেরই কাছাকাছি তাঁর জমিদারী—একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজখবর লইয়া হঠাৎ একদিন নিজেই উদ্যোগী হইয়া উহাকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে বিস্তর অযাচিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতেও হইয়াছিল; যাহারা ইতঃপূর্ব্বে অনাথাকে অন্ন ও আশ্রয় দিতে নারাজ ছিল, তাহারাই বিশেষ করিয়া তাহার এই আকস্মিকপ্রাপ্ত সুখ সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এমন কি সেখানের একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ও অনাহুত উপদেশ এ বিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতির এই আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধ শত বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়াই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিচিত্রময় জগতে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে, লোকে এই বিবাহকারী যুবককে পাগল বলিয়াই স্থির করিল, ক্বচিৎ কেহ বলিল দয়ালু কিন্তু তাহারাই মুখবিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু জাতি কিছুই ভাল নয়।

পরিমলের মনটা সেই সব ভয়াবহ পূর্ব্বস্মৃতির তোলাপাড়ার মধ্য দিয়া কোন্ সময় লঘু হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর জিদকে আর ততটা অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম বলিয়া তার মনে রহিল না, বরং চিরদিনের বিপন্ন-বৎসলতা ও অনন্যসাধারণ দয়া গুণের আধার বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহার স্বতঃ প্রবাহিত শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ বিপরীত স্রোতকে প্রতিহত করিয়া উথলিয়া উঠিয়া নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে একেবারেই ছোট করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবিচারের শাস্তি লইয়া স্বামীকে তুষ্ট করিতে মন তাহার উৎসুক ও অধীর হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছোটরে করিয়া ঘৃণা করিছ যে পাপ,
তোমারে করেছে নীচ তারি অভিশাপ।
তাদের না কর যদি উচ্চাসন দান,
ঘুচিবে না কভু তব 'নীচ' অপমান॥

—প্রবাসী

সূর্য্যের আলোভরা অলস মধুর মধ্যাহ্নে কলিকাতার এই কোলাহল-বিরল অংশ প্রায় পল্লীবিজনতা প্রাপ্ত হইয়া একখানি দৃশ্যের মতই প্রশান্ত হইয়া আছে! এই দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটীর দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন তাহার নিরালা ঘরে চুপ্‌টী করিয়া একটি চৌকির উপর খোলা জানালার ধারে বসিয়াছিল।

এই জানালার নীচের বাগানের রং বেরংএর কৃষ্ণকলি, জিনিয়া আর রজনীগন্ধা একেবারে প্রচুরতররূপে ফুটিয়া আছে। ইহারই ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি বাড়ীর সীমাবিভাগের প্রাচীরের গায়ে একটা বক ফুলের গাছ আধহেলা হইয়া রহিয়াছে; তাহার ডালপালার মধ্য হইতে একটা লুকানো পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর শিষ্‌ দেওয়ার শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ইহারই ঠিক পাশের অপরাজিতার ঝোপটাকে নাড়া দিয়া কয়েকটা শালিক কি যেন খুঁটিয়া খাইতেছিল, এবং কিচির মিচির শব্দে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করিতেছিল, সেটা কিন্তু বেশ বোধগম্য হইতেছিল না। বাগানের জমিটি নববর্ষার কয়েকটি বর্ষণ পাইয়াই নয়নসোভন শ্যামলতায় যেন চিকণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আর্দ্র তৃণ হইতে একটা অতি মৃদু সজল গন্ধ যেন সঙ্কুচিতভাবে উত্থিত হইয়া অনিচ্ছামন্থরভাবে বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির

বাহ্য জগতের এই স্তব্ধ আত্ম-সমাহিতভাব নিরঞ্জনের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ত অশান্তি ও নিরানন্দে ভরপূর চিত্তটিকে শুদ্ধ যেন তাহার সেই শান্তির মাধুর্য্যে পরিপূরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেন ইহাদের হইতে একটী অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করিয়া তাহার ভিতরেই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অহোরাত্র, জাগ্রতে এবং নিদ্রাতেও যে সান্ত্বনাবিহীন শান্তিহীন দুশ্চিন্তা বা দুষ্ট স্মৃতির তাড়নায় তাহার প্রত্যেক দণ্ড পলটুকু পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখভারাক্রান্ত সে সবই যেন তাহার মনের মধ্য হইতে এই শান্ত মধুর প্রকৃতির শান্তিধারা এই মুহূর্ত্তে ধৌত করিয়া দিয়াছে।

ঘরের দরজার কাছে খুট করিয়া একটু শব্দ হইল; দোরটা খুলিয়া গেল, পেঁচোর মা মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যটা ভাল করিয়া দেখিয়া তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল। একপাশে শয়নের নেয়ারবোনা খাট, আর এক ধারে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ আর তারই মধ্যে কয়েকখানা ছোট বড় নোট একখানা লেফাপার মধ্যে খোলাই পড়িয়া আছে। পেঁচোর মা প্রায় নিঃশব্দে সেইখানে আসিয়া উহার মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া আবার তেমনিভাবে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, গৃহাধিকারী ইহার বার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিল না। টাকাগুলা তাহাকে নরেশচন্দ্রেরই খাজাঞ্চির বেতন হিসাবে দিয়াছিল।

বাবুর খানসামা সাতকড়ি আসিয়া ডাকিয়া উঠিল "ম্যাষ্টর মশাই!"

প্রথম ডাকে নয়, দু তিন ডাকের পর নিরঞ্জন মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, "উঁ ?"

—"বলি মাইনে পেলেন, তা আমরা যে আপনার অসুখে বিসুখে এতটাই করলুম, বলি আমাদের বকশিষ কই ?"

নিরঞ্জন তদবস্থাতেই উত্তর দিল "নাওনা ভাই! ঐখানেই তো আছে।" সাতু এই উত্তরই আশা করিয়া পেঁচোর মার হেয় নীতি অবলম্বন করা অনর্থক বোধে উহা হইতে বিরত ছিল। খাম হইতে নোট কয়খানা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কত নিই?"

"যা তোমাদের খুসী।"

"তাহলে এই পঁচিশের মধ্যে পনের আমরা বকশিষ নিলুম, আর এই দশটা টাকা আমার কাছেই আমানত রইলো, দরকার হ'লে বলবেন বার করে দোব। বাড়ীর দাসী চাকরদের কারু কারু যে বেশ একটু হাত টান আছে, সে ত আমার কাছে ছাপা নেই, কে কখন গেঁড়া দিয়ে দেবে বইতো নয়, কি বলেন ম্যাষ্টর মশাই। রাখবো কি আমার সিন্ধুকে তুলে? তাতে খুব ভাল বিলিতি তৈরি কুলুপ লাগান আছে।"

নিরঞ্জন সবকথা—সব কেন একটা কথাও—কানে না তুলিয়া অমনি অমনিই জবাব দিয়া চুকিল, "বেশ।"—

বোকারাম মাষ্টারের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিতে করিতে প্রসন্নমনে সাতকড়ি টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল "বাবু তো পঁইত্রিশ টাকা দিয়েছিলেন, আর দশটা কোন চিলে এর মধ্যেই ছোঁ মারলে? অ্যাঁ! আমার মুখের গরাস কেড়ে খায়, সে ত সামান্যি নয়! যা হোক সন্ধান করতে হচ্চে।"

বক ফুলের গাছের ডালে সুখসমাসীন পাখীটা একটা তীক্ষ্ণ উচ্চরব করিয়া ডানা ঝাড়া দিতে দিতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সেই আকস্মিকশব্দে চকিত হইয়া উঠিতেই নিরঞ্জনের কর্ণে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি প্রবেশ করিল "মাষ্টার মশাই!"

আহ্বান নারী-কণ্ঠের, এবং তাহা যে 'পেঁচোর মা' শ্রেণীর কাহারও নহে, তাহা নিরঞ্জনের স্বাভাবিক বুদ্ধিই তাহাকে জানাইয়া দিল। সে

তার স্বভাবের বিরুদ্ধ একটু বিস্মিত ও উত্তেজিত ভাবে মুখ ফিরাইতেই এক সুদর্শনা নারীর সহিত মুখামুখী হইয়া গেল। রমণীর সাজসজ্জায় ও হাবভাবে তাহাকে উচ্চ জগতের জীব বলিয়া চিনিয়া লইতে উহার বিলম্ব ঘটিল না এবং এই পরিচয়ে একাধারে বিপন্ন, বিরক্ত ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়া নিরঞ্জন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, হাত তুলিয়া ইহার উদ্দেশ্যে সে একটা ভদ্রতার নমস্কার পর্য্যন্ত জানাইতে সমর্থ হইল না।

ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল বাড়ীর কর্ত্রী স্বয়ং। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল বলিয়াই সে নিজের সেই ভুল শোধরাইয়া লইবার সদিচ্ছায় তাঁহার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আনিয়াছিল,—কিন্তু সে যে এত কঠিন, এ ধারণা তার একটু পূর্ব্বেও ছিল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে সে চাহিতে ভরসা করে নাই, তাহার জুতাখোলা পায়ের দিকেই তার চোখ ছিল। বসন্তের গভীরতর ক্ষত চিহ্নের সেখানেও অভাব ছিল না। তার উপর সেই দুর্ব্বল শীর্ণ পা দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে লক্ষ্য করিয়া কিছু দয়ার্দ্র ভাবেই বলিয়া ফেলিল "আমি আপনার কাছে পড়তে এসেছিলুম, যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, তাহলে আজ থাক।"

এই বলিয়াই সে উহার দিকে পিছন ফিরিতে গিয়া পশ্চাত হইতে এমন একটা সুর শুনিতে পাইল এবং তাহাতে এমন করিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল যে, যেন সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল ও ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একটা আকস্মিক বর্শার মতই আসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের হাড়ের মধ্যে তার তীক্ষ্ণ ফলাটাকে সবেগে বিঁধিয়া দিয়াছিল। ভয়ার্ত্ত মুখের পাংশু ছবি লইয়া আবার সে চকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সাম্‌নে তাহার কীটদষ্ট পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মতই এক বসন্তক্ষত বিকৃত এবং আগুনে বা অপর কোন দাহ্য পদার্থের দ্বারায় অধিকতর

বিকৃতিপ্রাপ্ত অপরিচিত মুখ! তবে সেই তাহার পরিচিত স্বরের লেখা কোথা হইতে অকস্মাৎ এই অজানাকে আশ্রয় করিয়া আজ এত দিন পরে আবার এই জাগ্রত মধ্যাহ্নে ভাসিয়া আসিল? সেকি স্বপ্ন না সত্য? পরিমলের বুকের মধ্যে সন্দেহ আশঙ্কা ও তার সঙ্গেই মিশ্রিত একটুখানি যেন আগ্রহও এক সঙ্গে একটা অজানা তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন—স্বপ্ন ইহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে? মানুষ কখন জাগিয়া থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারে? সে উৎসুক-নেত্রে উৎকণ্ঠা ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া করিয়াই নিরঞ্জনের নতমুখ দেখিতে লাগিল এবং অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টিকে ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিয়া পূর্ণ অবিশ্বাসে, দীর্ঘ করিয়া একটা শ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, "বই তো আমি কিছুই আনিনি, যাহোক একটু পড়ান; ইনি বলে গেছেন, আপনার কাছে পড়তে।"

নিরঞ্জনের যে কথার স্বরে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল,তাহা এই "আপনি কি পড়তে চান বলুন, আমি পড়াচ্চি।"

এবার নিরঞ্জন এই কথাটার মধ্য দিয়া অনেকখানিই অনুভব করিল। তাহার চাকরীটা যে কি, এতদিনের পর সেইটাই এবার তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, তা সেটা যে এমন মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে,এ সংশয় সে অভাগার মনের কোনেও কখন উদিত হয় নাই। নরেশ অবশ্য কাজটাকে খুব কঠিন বলিয়াই স্বীকার করিয়া প্রথমাবধি এতৎসম্বন্ধে তাহার কৃতকার্য্যতারও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না,– কিন্তু সেটা যে এমনই কঠিনরূপে প্রকাশ পাইবে তাহা জানা থাকিলে, নিরঞ্জন হয়ত –তা'জানা থাকিলেই বা নিরঞ্জন কি করিতে পারিত? জীবন ও আশ্রয়-দাতাকে সে কি মুখের উপর বলিতে পারিত যে, তাঁহার এই সামান্য কাজটুকুও তাহার দ্বারায়

ঘটা সম্ভব নয়? প্রাণপণে নিজের সকল সঙ্কোচকে সে মনের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের কম্পনকে যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "তা'হলে লাইব্রেরি থেকে কোন বই বেছে দেবেন চলুন; এখানে তো কোনই বই নেই।"

পরিমলের পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত প্রবলবেগে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া চলিয়া গেল। সে আবার বৃথাই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই ভস্মস্তূপবৎ ভীষণদর্শন দগ্ধমুখের রহস্য-জটিলতা যেন উলটিয়া উলটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছু না, কোন নিদর্শনই ত নাই! তবে কোথা হইতে, কেমন করিয়া সেই পরিচিত,—বড় পরিচিত কণ্ঠের শব্দটুকু, আজ বারেবারেই সুদূর অতীত, করুণ কঠিন ভয়াবহ অতীতের—মধ্য হইতে তার সমস্ত বিস্মৃতির ধূলি জঞ্জাল ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে? একি তবে পরিমলের কল্পনা মাত্র? একি সত্য নয়? একি তার মনের মধ্যের স্মৃতির তারে যে অবিস্মৃত অতীত আজিও দিনে রাত্রে সকল সময় সকল সুখ-সম্পদের মধ্য দিয়াও করুণ ও কাতর মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে থাকে, তারই একটা রেস, আর কিছুই নয়? আবার একটা দীর্ঘতর নিশ্বাস সে মোচন করিল এবং তারপর নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্যই ইহার সান্নিধ্য ছাড়াইতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "আজ থাক, কাল বই নিয়ে আসবো,"—এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিজের পরিত্যক্ত আসন খানার উপর সবেগে বসিয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক নিরঞ্জন আর্ত্তকণ্ঠে আত্মগত কহিয়া উঠিল, "আবার সেই ছায়া! সে নয়—তবু যেন সেই! নাঃ, মানুষ আমায় আর থাকতে দিলে না। আবার দেখছি পাগল করে আমায় পথে বার করে দেবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায়, বিষম ঝড়ে,
নাই মা. বধূ নাই, খেতে কে দেবে ভাই,
কে তা'রে দেবে ঠাঁই বৃষ্টি পড়ে।

—তীর্থ সলিল।

পঠন পাঠন চলিতে লাগিল। যদিও গুরু শিষ্যা উভয়েরই পক্ষে এই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ ব্যাপারের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ বা আনন্দের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ছিল না ; উভয় পক্ষের সবটুকুই শুধু দায় ঠেলার খাতির, সুতরাং ফলও ঠিক তদনুযায়ী প্রচুরতররূপে ফলিয়া উঠিতে লাগিল, অর্থাৎ বড় একটাই দেখা গেল না। পরিমল প্রথম দিনের সেই সঞ্চারিত সঙ্কোচকে প্রাণপণে যুক্তিতর্ক ও সিদ্ধান্তের দ্বারায় কোনমতে তাহার মন হইতে অপসৃত করিয়াছিল। নিজেকে সে এই বলিয়াই শান্ত করিতে চাহিল যে, মানুষের মত মানুষ যে কত থাকে ; একজনের গলার সুরের মতন কি আর আর এক-জনের গলার স্বর থাকে না? এর হাসি তো দেখিনি ; বোধ হয় এ মোটেই হাসে না, কিন্তু তাঁর,— তাঁর হাসিটীই যে তাঁর সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য ছিল। এর আড়ন সেই রকমই বটে, কিন্তু সে রং, সে চোখ, সে চুল, সেই বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠন— সে সব এর কোথায় কি? তারপর তাহার ঠোটের কোণে একটী ফোঁটা হাসি এবং চোখের কোনে ফোঁটা দুই অশ্রু দেখা দিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমিও কি পাগলের বাতাস লেগে পাগল হলেম নাকি? কি ছাই ভাবছি? যাকে নিজের চোখে মরতে দেখলেম, পুড়িয়ে পর্য্যন্ত এলো,

তার সঙ্গে কার কতটুকু মিল কোথায় খুঁজলে পাওয়া যায়, সেই ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে লাভ? মনকে সে কড়া হুকুমে ঠাণ্ডা করিতে চাহিল। সেদিন পড়িতে গিয়াই সে বই খুলিবার আগে ভাগেই মুখ খুলিয়া এবং মুখ তুলিয়া নিরঞ্জনের বিদগ্ধ ও বিব্রত মুখের দিকে করুণচোখে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতরটা যেন করুণায় ও বেদনায় নিবিড়ভাবে ভরিয়া আসিল, তখন সে গভীর সহানুভূতি ও ব্যথায় বিজড়িত চিত্তে তাহার সহিত আলাপ করিতে বসিল। নিরঞ্জন নতমুখে তাহার পাঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ম্যাকমিলানের ছাপা স্কুল পাঠ্য বইএর মাপাজোকা রচনার পরিবর্ত্তে তাহার কানে আসিয়া সবিস্ময়ে এই প্রশ্নটা প্রবেশ করিল—

"আচ্ছা মাষ্টার মশাই! আপনার দেশ কোনখানে ছিল?"—

নিরঞ্জন প্রথমে চমকিয়া উঠিল; তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল; আরও খানিক পরে সে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "বসিরহাট"।

"বসিরহাট! তবেতো ঠাকুরঝিদের দেশেরই লোক আপনি! হারাণ চন্দ্র ঘোষেদের জানেন? নাম শুনেছেন অবশ্য? সেই হারাণঘোষের মেজে-ছেলেই আমার নন্দাই। তার নাম জ্যোতিঃ প্রসাদ ঘোষ। সে গেল বছর ওকালতি পাশ করে উকিল হয়েছে। জানেন তাকে? বড্ড ভাল ছেলে সে। নেহাৎ ভালমানুষ, যেন গো-বেচারী একেবারে!—"

পরিমলের মনের মধ্যে বোধ করি মানুষের পরিচয়ে তাহার গো-জন্মের আভাসটা একটু বেশী পরিমাণে সুব্যক্ত হওয়াটাকেই তাহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বোধ ছিল, সেই জন্যই সে সুযোগ পাওয়া মাত্রে তাহার এই নিরীহ প্রকৃতির নন্দাইটীর প্রশংসা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে

করিয়া বসিল, এবং ইহার মধ্যে প্রসুপ্ত রহিল যাহারা 'গো-বেচারা' নহে, তাহাদেরই সম্বন্ধে ঈষৎ একটুখানি গ্লানির আভাস।

নিরঞ্জন আবার যেন কতকটাই ইতস্ততঃ করিল। তারপর সঙ্কুচিতভাবে সে জবাব দিল, "না না, ওঁকে আমি চিনিনে, আমি অনেকদিন দেশ ছাড়া।"

ঈষৎ দমিয়া গিয়া পরিমল তখন ছোট্ট করিয়া একটা "ওঃ" বলিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তকের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল, এবং তৎপরে পুনশ্চ একটুখানি আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? আপনার মা বাবা নেই বোধ হয়? আচ্ছা, ভাই বোন নিশ্চয়ই আছেন? আর কেউ? আর কোন আত্মীয়?"

একটা দীর্ঘ ও ব্যথাভারাতুর নিংশ্বাসের শব্দ তাহার সকল উৎসাহকেই দমিত করিয়া দিয়া আরও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল,—"কেউ না।"

পরিমলের বুকের মধ্যে এই আর্ত্তস্বরটা এম্‌নি ভীষণবলে বাজিয়া উঠিল যে, সেই নিঃসঙ্গ নিঃশেষিত মরুভূমির মতই জীবনের ভয়াবহ শূন্যময়তা সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরেরও অন্তরে অনুভব করিল ও তাহার অকৃত্রিম সহানুভূতি একান্তভাবেই এই সর্ব্বহারা এবং আত্মহারা অভাগাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে যে জানে,—এই নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব পরিত্যক্ত জীবনের দুঃখ যে কি বিষম, কি দুর্ব্বিসহ—সে যে নিজে তার ভুক্তভোগী! সে যে নিজের বুকের ভিতর হইতে এ অপরিমেয় দুঃখের রিক্ততা ও তিক্ততা আজও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেছে! যদি যে সদয়চিত্ত এই পথপ্রান্তের মরণশয্যালীন দুরবস্থার চরমে পতিত ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়া সযত্ন সেবায় জীয়াইয়া তুলিলেন, সেই তাঁহারই উদার অন্তর তাহারও জন্য না কাঁদিত,—যদি সেই তিনিই তাহাকেও

ওম্‌নি করিয়াই পথের ধূলার মাঝখান হইতে—শুধু তাই নয়—একেবারে নিজের বুকে তুলিয়া না লইতেন,—তবে আজ তাহার অবস্থা ইহার চাইতেও আর একটু শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত কি না তাও বেশ জোর করিয়া বলা যায় না! স্বামীর দয়া যে কি অসীম, এবং তাঁহার পরে তাহার কৃতজ্ঞতা যে কতই গভীরতর হওয়া উচিত, তাই ভাবিয়া, ও নিজের মধ্যে যে জিনিষটা অপর্য্যাপ্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা পর্য্যাপ্ত দেখিয়া, নিজের প্রতি সে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মনটাকে অন্যদিকে ফিরাইতে চাহিয়া তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতের লেখাটী তো খুবই সুন্দর! ইংরেজী উচ্চারণও খুব কম জানার মতন লাগে না। তাহলে আপনি কেন কাজ কর্ম্ম না করে অত কষ্ট সইছিলেন? কতদিন বাড়ীছাড়া হয়েছেন আপনি?"

নিরঞ্জন এই প্রশ্নগুলা নতমুখে শুনিয়া গেল। কিন্তু তাহার ভাবশূন্য নিশ্চল শরীরে ইহার উত্তরের কোন চেষ্টা জাগ্রত হইতেছে কি না, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। অগত্যা পরিমল তাহার কৌতূহলবৃত্তিকে দমনে রাখিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিল এবং অনেকখানি পড়া হইয়া গেলে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মাষ্টার মশাইএর কানে তাহার পাঠের শব্দটুকু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে না, এম্‌নি গভীরতর অন্যমনস্কতায় তাহার মনকে অভিভূত প্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তখন সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাকবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল ও তারপরই কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সমস্ত শরীরে ও মনে ভীষণ ভাবে শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়া গেল, সে যেন কোন এ-জগতের প্রাণীর সান্নিধ্যে নাই,—এই যে মানুষটির সামনে সে রহিয়াছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যেন কোথায়ও একটু যোগ আছে

কিন্তু সে যেন পুরোপুরি এখানের নয়। চেহারাখানা এর মোটামুটী দেখিতে মানুষেরই মত বটে, গলার স্বরও এই দেশেরই সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, কিন্তু না,—তবু না—কিছুতেই ইহাকে যেন রক্তমাংসের জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না! এ যেন কোথাকার একটা ছায়া, কোন্ দূরান্তর প্রস্থিতের একটুখানি মায়ামূর্ত্তি এর মধ্যে খুঁজিলে, পাওয়া যায়। শুধু সেইটুকু-- আর বাকি সবখানিই এর অবাস্তব, অসঙ্গত, অনাসৃষ্টি! পরিমলের মনের মধ্যটা ছমছমে হইয়া উঠিল। এই শব্দহীন,—স্পন্দনেরও চিহ্ন যাহার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট নয়—তাহার সান্নিধ্যকে সভয়ে বর্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

নরেশ সেদিন অপরাহ্নে তখন বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, পরিমল খবর দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেখ, নিরঞ্জনকে আর কোন কাজ দিয়ে আমার জন্য অন্য কোন শিক্ষয়িত্রী ঠিক করে দিতে পারো না? সেই যদি পরিশ্রমই করবো, তা'হলে যাতে কাজ হয়, সেই রকমই তো করা ভাল।"

নরেশ ইদানীং পরিমলের মুখে মাষ্টার মশাই'এর বিদ্যাবুদ্ধি ও বিনয়ের বিস্তর খ্যাতি শুনিতেছিলেন। আজ আবার হঠাৎ এই অনুযোগে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আবার কি হলো?"

পরিমল বলিল, "হয় নি কিছুই, তবে পড়া বড় হয় না কিনা তাই বল্‌ছি, উনি বড্ডই অন্যমনস্ক, আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়।"

নরেশ নিজেও এটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই স্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ঈষৎ চিন্তিতমুখে কহিলেন, "আচ্ছা তা হলে ভেবে চিন্তে দেখি, ওকে আর কি কাজ দিতে পারা যায়। কিছু না দিলে তো ওকে ওম্‌নি রাখা যাবে না, সেই যে হয়েছে মহা মুস্কিল!"

পরিমল বোধকরি পূর্ব্বাবধি এ বিষয়ে কিছু কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছিল,

সে প্রস্তাব করিল—"ছাপাখানার কোন কাজ দেওয়া চলে না?"

নরেশ কহিলেন "দেখি, তাই না হয় কোন কিছু যদি পারে। বাংলাটা কি রকম জানে বুঝলে কিছু? ইংরাজী যে মন্দ জানে না, সেটা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু বাংলা যদি তেমন—"

পরিমল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া আসিল ও উহা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল "পড়ে দেখ।"

নরেশ কাগজটার ভাঁজ খুলিয়া দেখিলেন তাহার ভিতর পৃষ্ঠায় একটা কবিতা লেখা। কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন,—

"কাঁদিতে এসেছি আমি কাঁদিয়াই চলে যাব,
এসেছি অনন্ত হতে অনন্তেই মিশাইব।
দুঃখের তরঙ্গ তুলি, এসেছি আপনা ভুলি,
খুঁজিব বিরাট বিশ্ব কোথা গেলে সীমা পাব।

জগতে হবে না সুখী এ পোড়া পরাণ মন।
অসীম দুঃখেরে আমি করে আছি আলিঙ্গন।
আপনি নীরবে রহি, আপন যাতনা সহি,
অপরে করিতে দুঃখী চাহে নাকো এ জীবন।

ভবের সুখের আশা করিয়াছি বিসর্জ্জন।
না চাহি কাহারও স্নেহ কাহারও ভালবাসা,
রাখিনে রাখিনে মনে পার্থিব প্রেমের আশা
কারও উপেক্ষার হাসি, সহিতে গঞ্জনা রাশি—"

কবিতা অসমাপ্ত। নরেশ পাঠশেষে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে লিখেছে— নিরঞ্জন?"

পরিমল মাথা দুলাইয়া সায় দিল। তারপর বলিল "আরও দুটো একটা

ওঁর টেবিলে পড়ে থাকতে দেখেছি, একটা মোটে ক'টা লাইন লেখা। সেটা আমার মনেই আছে।

পাবো কি না পাব ফিরে কেন বৃথা এত ভয় ?
কেন, কেন এ সংশয় ?
যখন দাঁড়াব গিয়ে তোমার চরণতলে,
আমার গচ্ছিত নিধি ফিরাইয়া দাও বলে,
না দিয়ে পারিবে কিগো ফিরাইতে দয়াময় !
তবে কেন এ সংশয় ?

দেখ, মাষ্টার মশাইএর বউ নিশ্চয় ছিল, মরে গেছে, তাইতে ওঁর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না ?—কিন্তু স্ত্রীকে কি রকম ভালবাসে বলতো ?"

নরেশ হাসিয়া নিজের স্ত্রীর গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া জবাব দিলেন, "ঠিক যেন মহাদেবের সঙ্গে সমান ! স্ত্রীটীও হয়ত সতী-ঠাক্‌রুণের মতই পতির জন্য দেহ ত্যাগ করে থাকবেন। তা না হলে কি আর অতটাই পারা যায় ?"

কথাটার মধ্যে বেশ একটুখানি খোঁচা খাইয়া পরিমলও সেটুকু তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দিল।—"তাই কি আর বল্‌তে পারা যায় ? এই সেদিন কালীঘাটে একটী মেয়ে স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ দেখে আর ডাক্তারের মুখে 'আশাহীন' কথাটা শুনেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে তক্ষুনি নিজের প্রাণটা নষ্ট করে ফেল্লে, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকটী সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং স্ত্রীর অত বড় আত্মত্যাগের মূল্য শোধ করলেন কি দিয়ে জানো ? বৎসর না ঘুরতেই একটী নূতন বউ ঘরে এনে। এই তো সব তোমরা !"

নরেশ এ ঘটনাটি জানিতেন, কাজেই মাথা পাতিয়া এই নিন্দাটুকু

গ্রহণ করিয়া লইতেই হইল এবং হাসিয়া উঠিয়া রহস্য করিয়া জবাব দিতে হইল "তা মহাদেবও ত শেষটায় পার্ব্বতীকে বিয়ে করে ছিলেন। স্তারটীরও হয়ত সেই রকমই অংশাবতার হয়েছিল টিল, তার কে' কি জানে বলো! আচ্ছা তাহলে নিরঞ্জনকে আমাদের 'কর্ণধারেরই' কর্ণ ধরিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমার উক্ত কার্য্যেব জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর খোঁজ খবর করতে হবে।"

পরিমল কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া চাপা হাসির মধ্যে তর্জ্জন করিয়া উঠিল "যাও।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল তুমি মহীয়ান,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ।

৺ইন্দিরা দেবী।

আদিগঙ্গার উপরে ছোট্ট একখানি লালরংয়ের দোতালা বাড়ীর গঙ্গার ধারের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ছাদে কয়েকটী ফুলের গাছ টবে সাজান এবং তারই মধ্যে একখানি কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া একটী মেয়ে সেতার বাজাইতেছিল। টবের গাছগুলি সদ্যজলসিক্ত, তখনও ভিজামাটীর গন্ধটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া বহিয়াছে। রজনীগন্ধা দুএকটা জুঁই এবং কতকগুলি ভুইচাঁপা, জিনিয়া আর বসমিয়া জাতীয় ফুল অল্প বিস্তর ফুটিয়া রহিয়াছে। গোলাপের গাছ দুটো একটা আছে কিন্তু ফুল তাহাতে একটাও ফুটিয়া উঠে নাই।

মেয়েটীর বয়স সতের বা আঠরোর বেশী নয়। রূপ, হাঁ, তা রূপ তাহার শরীরে নেহাৎ কম ছিল না। গোলগাল গড়ন, অথচ একটু ক্ষীণ দেহ, রং আরমানী বিবিদের মত না হোক তবু সচরাচর যাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে ফরসা রং বলে তাইতেই একটু খানি জৌলুস ছিল। চোক দুটি মাঝারি, নাক, কপাল, ঠোঁট সবই তাহার মাঝামাঝি, শুধু চুলগুলিতে বড় বেশী বিশেষত্ব ছিল।—কোঁকড়ান না হইলেও, রেশমের মতন নরম, কাল ও ঢেউখেলান খোলা চুলগুলি তাহার বাজনার তালে তালে তাল দিয়া যখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, তখন অপরাহ্ণের শুক্তি-শুভ্র আকাশের একপ্রান্তে আকস্মিক উদিত প্রাবৃট মেঘের কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। একেবারেই নিরাড়ম্বর বেশভূষণে এই সুশ্রী

মেয়েটিকে যেন বেশী করিয়াই সুন্দরী মনে হইতেছিল। বাজনা বাজানর সখ মিটিয়া গেলে সে কোলের উপর হইতে যন্ত্রটাকে নিজের পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া দিয়া বেঞ্চির পিঠের উপর নিজের পিঠ চাপিয়া একটু আয়েস করিয়া বসিল এবং তারপর গুণ গুণ করিয়া একটা গান আপনার মনেই গাহিতে লাগিল। বাজনায় সুর যখন চড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশের বাড়ীর ছাদে যে যুবকটি প্রায় প্রত্যহই তাহার উচু পাঁচিলের ছোট ছোট ফুকর দিয়া তাহার অদৃশ্যপ্রায় মুর্ত্তিটাকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কৃতার্থ হইবার লোভে উঁকিঝুঁকি মারিয়া শেষে বিরক্তমনে আর এক দিকে চলিয়া যায়, আজও তাহার সেতারের সুর নিজের সেই নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে ত্রুটি রাখে নাই; কিন্তু গানের এ গুঞ্জন সেই উৎসুক পিয়াসীর কর্ণগোচর পর্য্যন্ত হইল না, এ শুধু এই পুষ্পবাসিত, নিরালা ছাদটির বুকেই একা একা নিজের সকরুণ মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। সে একেবারেই যেন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অন্তমনস্কভাবে গাহিতেছিল—

"এসো এসো ফিরে এসো, বঁধুহে, ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত—নাথহে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো, ওগো করুণ কোমল এসো,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত, সুন্দর ফিরে এসো।"

গানের সঙ্গে যখন প্রাণের ঘনিষ্টতর সংযোগ ঘটিয়া উঠে, তখন গানের বাণী আর বাহিরের শব্দ মাত্র থাকে না. তাহা প্রাণের কথায় পরিণত হইয়া যায়, গান তখন ধ্যানের আসন গ্রহণ করে। এই গায়িকাও তেমনিতর তন্মনস্ক হইয়া গিয়া বেঞ্চির পিঠে মাথা রাখিয়া এলায়িতদেহে অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে পায়ের তালে তাল দিয়া যেন গানের বাণী ভুলিয়া গিয়া প্রাণের ভাষাতেই ভাসিয়া চলিতেছিল,—

"আমার নিতি সুখ ফিরে এসো, আমার চিরসুখ ফিরে এসো;
আমার, সব সুখ দুঃখ মন্থন করা বাঞ্ছিত ফিরে এসো,"—

এই ছাদে আসিতে হইলে সিঁড়িতে উঠিয়া যে দালানটা পার হইয়া আসিতে হয় সেইখানে ঠিক সেই সিঁড়ির মাথায় জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল। গানের সুরে ও ভাবে মন ছাইয়া থাকায় গীতকারিণী তাহা জানিতে পারে নাই দেখিয়া, যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, সে সেইখানেই একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। চুরি করিয়া পাশের বাড়ীর লোকটির মতন গান শোনার জন্য যে রহিল তাহার মুখ দেখিয়া ত' মনে হইল না; বোধ করি কোন একটা সংশয় বা দ্বিধায় পড়িয়াই সে ওই রকম চলচ্চিত্ত বা মানসিক কোন দ্বিধায় দোদুল্যমান হইয়াই স্থির রহিল। একবার তার যেন যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবার জন্যও মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার সিঁড়ির ধাপের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই প্রমাণ করিয়া দিল; আবার কি ভাবিয়া কে জানে সে নিজেকে ফিরাইয়া লইয়া ছাদের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর যেন মনকে আরও একটু শক্ত করিয়া লইয়া একেবারে গট গট করিয়া সঙ্গীতকারিণীর পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল—

বোধ করি বা একটু শব্দ হইয়া থাকিবে---মেয়েটি তথনই গান বন্ধ করিল। চোক মেলিয়া ও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, তার পর মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া চুলের গোছাটাকে ঠেলিয়া দিয়া সে মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে পড়িয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া অতঃপর সে চুপটি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রকার ভাল মন্দ একটি সম্ভাষণের কথাও তাহার মুখ দিয়া যেন বাহির হইল না। মনের মধ্যে একটা বড় রকম ঝড়ের

হাওয়া বহিয়া গেল কি না তা অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে ওই গানটাই যে সে বিশেষ করিয়া এমন সময়টায় গাহিতেছিল ইহারই জন্য লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ঘুরিয়া আসিয়া ইহার পরিত্যক্ত আসন খানায় বসিয়া পড়িলেন এবং ইহারই হস্তচ্যুত বাজনাটা নিজের জানুর উপর তুলিয়া ধরিয়া বাজনা রাখা জায়গাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া উহাকে আমন্ত্রণ করিলেন, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "বসো"।

মেয়েটী উহার পাশের জায়গাটীতে না বসিয়া খানিকটা দূরে খালি মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তখন নরেশ—আগন্তুক নরেশচন্দ্র একবার বিব্রত ও অনুসন্ধিৎসুচক্ষে উহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণে সেতারে ঝঙ্কার তুলিয়া অনুরোধের সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একটা গাইবে কি?"

মেয়েটীর মুখের উপর কোন ভাবের রেখাই পড়ে নাই,—তা যা ছিল সে তার মনের ভিতরেই লুকানো ছিল, মুখখানাকে অমন ভাবশূন্য রাখিতে মনের মধ্যে তাহার যে কত খানি বেগ দিতে হইতেছিল, তা' শুধু সেই জানে, তবে বাহিরে সে চেষ্টাটা তার ব্যর্থ হয় নাই। মাথা হেলাইয়া সে নিজের সম্মতি জানাইলে নরেশ অনির্দ্দেশ্যভাবে তারের উপর আঙ্গুলীর ঘা দিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন "কোন্‌টা গাইবে?"

সে নম্রস্বরে জবাব দিল "যেটা বল্‌বেন!"

"আমি যেটা বল্‌বো সেটাই যে তোমার গাইতে ইচ্ছে হবে, এমন কি কথা আছে? যেটা তোমার ভাল লাগবে সেইটাই তার চাইতে গাও না কেন সুষমা!"

সুষমা ক্ষণকাল মাথা নত করিয়া কি ভাবিল, তারপর মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে গান ধরিল—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,—
প্রভু! তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে,—
যায় যেন মোর গভীরতর আশা—
প্রভু! তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে,—

গানটা আরম্ভ করিয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল, এ গানও আজ ইঁহার সাক্ষাতে তাহার গাওয়া ভাল হয় নাই। আধ্যাত্মিক হিসাবে এ সব খুবই বড় জিনিষ বটে এবং ছোট বড় সবারই এ জিনিষের উপর দাওয়া আছে। কিন্তু মানুষ সব কিছুরই বড়র দিকটার চাইতে ক্ষুদ্র অংশটুকুকেই যে বড় সহজে দেখিতে পায়- অথবা দেখিতেই চাহে। অর্থ বিকৃতি ঘটাইয়া এই সর্ব্বস্বান্তকর আত্ম-নিবেদনকে যে নিজের ভোগে লাগাইতে না পারা যায় তাওতো নয়! তার চেয়ে সে যদি গাহিত,—

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধুলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখেরই জলে!"

না, তাহাতেও তার মনের দুর্ব্বলতা হয়ত ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘুচিত না!—উপায় নাই!

গান শেষে নরেশ বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফুল গাছের টবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রশংসাসূচকভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ ভারি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে তো তোমার! সুষমা! তোমার সেই চন্দনা কি কি কথা কইতে শিখেছে? কই সেটাকে যে দেখছিনে? ননীবাবু তো তার প্রশংসা করতে শত মুখ হয়ে ওঠেন।"

সুষমাও তাহার মান্যবান অতিথির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; জবাব দিল "সেটাকে আমি খাঁচাখুলে উড়িয়ে দিয়েচি।"

উড়িয়ে দিয়েছ! ওঃ অসাবধানে উড়ে গেছে বুঝি? সুন্দর পাখীটা ছিল!"

"সুন্দর বলেই তো তাকে তার কুৎসিৎ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিলাম। স্বাধীন হয়ে কি আনন্দেই সে উধাও হয়ে নীল আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল! তার মনে তখন কতই না আনন্দ হচ্ছিল!"

নরেশ মৌন বিস্ময়ে দু চোখ ভরিয়া সেই এতক্ষণকার নির্ব্বাক এবং এক্ষণে উচ্ছ্বসিতমুখী নারীর সহসা উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন তাহার মনের ভাবটা একটুখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া চয়ন-করা-এক-গোছা রজনীগন্ধা লইয়াই ফিরিয়া তাহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, শান্তিকণ্ঠে কহিলেন, "সুষমা! স্বাধীন হওয়াই কি সর্ব্বত্র বাঞ্ছিত? স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নেই, লজ্জা নেই?"

সুষমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "আছে, যতদিন না মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস করতে শেখে সে আশঙ্কাও ততদিনের, কিন্তু যদি কোন দেবতার আশীর্ব্বাদ তাকে স্বাবলম্বনের মহৎ শিক্ষায় দৃঢ়করে তুলতে পারে তখন—তারপর থেকে অধীন জীবনেব লজ্জা তার পক্ষে সব চেয়ে বড় লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় না কি?"

নরেশ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর অতি মৃদু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমায় আসতে লিখেছিলে কেন?"

সুষমা আবার নতমুখী হইল, নরেশের দৃষ্টি হইতে নিজের মুখ সে একটুখানি আড়াল করিয়া রাখিয়া শান্ত অথচ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল "এমন করে আর তো আমার দিন কাটচে না, তারই একটা উপায় করে দেবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমার অপরাধ দয়া করে নেবেন না। এ মহা পাপকে যখন ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তখন তো ফেলতেও পারচেন না; কিন্তু যা ভাল হয় কোন কিছু একটা করুন: না

হয় এই খাঁচার দরজাটা খুলেই দিন। আমি এমন করে থাকলে পাগল হয়ে যাব বোধ হচ্চে।”

নরেশচন্দ্র এই কথায় একটুখানি ব্যথিত হইলেন। সহসা জোর করিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ঈষৎ আবেগ ভরে কহিয়া উঠিলেন, “আমার নির্লিপ্ততা তোমায় দুঃখ দিয়েছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমিই যে আমার কাছ থেকে সে অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়েছ সুষমা! আমায় যে তুমি বারণ করেছিলে,—তাতেই ত আসি নি।”

সুষমা মুখ তুলিল না। সেই আধ-ফেরানো মুখেই চাপাকণ্ঠে সে উত্তর দিল “ঈশ্বর জানেন তার জন্য আমি একটুও দুঃখিত নই। আপনার অম্লান চরিত্র আমার জন্য লোকের চোখে আজও ম্লান হয়ে রয়েচে, আর সে দাগ নারায়ণের বুকের ভৃগুপদচিহ্নের মতন হয়ত চিরস্থায়ী হয়েই রইলো। এতবড় অভাগীকে যে শুধুই নিজের দয়াগুণে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন,—তেমন কথা বিশ্বাস করবার মত উদারতা এ সংসারে ক'জনের আছে। তার উপর এখন আপনি বিয়ে করেছেন। আপনার স্ত্রী, বৌ-রাণীর কানে যদি ওঠে, আপনাদের দাম্পত্য জীবনের শান্তি নষ্ট হবে, সে আমি জানি বই কি! তা নয়, তা নয়; বিশ্বাস করুন; কিন্তু সত্যি সত্যি আর যে আমি পারচি না। আমার এ বন্ধনহীন অবস্থা আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না! আপনি বুঝতে পারচেন না, আমার এই খাঁচা আমার কত বড় অসহ্যই যে হয়ে উঠেছে! এর বাইরে আমায় কাজ দিন—যাহোক একটা সামান্য কাজ দিন। কাজের অভাবে আমি মরে যাচ্চি। আমি যে একটা মানুষ. আমি যে যন্ত্র নই, এই মহা বিড়ম্বনায় প্রাণ আমার বার হয়ে যাচ্চে। শুধু গান, শুধু বাজনা, শুধু খাওয়া ও ঘুমান, এ কি সহ্য করা যায়?

সুষমা সুগভীর নিশ্বাসে যেন তাহার অন্তরস্থ অসহনীয় যন্ত্রণানলের অনেকখানি বাহিরে প্রেরণ করিয়া নীরব হইল, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোমল চিত্তে তাহার সেই মর্ম্মবিদারী বেদনার কাতর কণ্ঠ অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই সুরভরা বীণার তারের মত আপনা আপনি বাজিয়া চলিল। এযে কত বড় ব্যথার অভিব্যক্তি, কি হতাশার আবেদন, সে কথা যে তিনি জানিতেন।

একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন "আমি বুঝি বই কি বেদানা! তোমার দুঃখ যদি আমি না বুঝতুম,—সেই প্রথম দেখার দিনে, এতটুকু ছোট্ট মেয়ে যখন তুমি, সেই তখন থেকেই যদি না বুঝতুম,—তা হলে হয়ত তোমায় আজ আমার এত কাছে এনে দিতে পারতো না! আমি জানি,—তোমার দুঃখ আমি জানি। তোমার আত্মত্যাগ সেও যে কত বড় তাও আমার অজ্ঞাত নয়। সে যদি ভুলতে পারতুম, আজ তোমায় আমাকে চিঠি লিখে ডেকে আনতে হতো না। কিন্তু শোন সুষমা! তোমার এই বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আমি ক্রমাগতই ভেবেছি, ভেবে কিন্তু কোন কুল কিনারাই খুঁজে পাই নি। দেখ, হয়ত এখনও অনেকদিন তোমায় বাঁচতে হবে। তার আগে রোগ ও জরার আক্রমণে অক্ষম হয়ে সেবার দরকার হওয়ারও কিছুই বিচিত্র নয়। তারপর একটা অবলম্বন না রাখলে চিরদিন তোমার কাটবেই বা কি নিয়ে? কোন একটা পথ তুমি এখনও বেছে নাও।"

সুষমা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না, বা দিবার চেষ্টাও দেখাইল না।

নরেশ তাহার এই নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যে ইহাকে অর্দ্ধ সম্মতি মনে করিয়া ঈষৎ উৎসাহিতভাবে কহিতে লাগিলেন—"তোমার মায়ের যে ইচ্ছার উপর আমি তোমার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেম, দেখছি তোমার

মনের সঙ্গে সেটা ঠিক সায় দিচ্ছে না। তুমি সেদিকে মন দিতে পরচো না।—"

সুষমা কহিল, "তাই বা পারচি কই?"

নরেশ ক্ষণকালের জন্য সচিন্তিত নীরব থাকিয়া পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন "কিন্তু একটা মানুষের জীবন যে কোন রকমের কর্ম্মবন্ধন শূন্য, নিরালম্ব ও ভবিষ্যতের আশাভরসাবিহীনভাবে টেঁকে থাকতে পারে না, সে ত তুমি ক্রমেই বুঝতে পারচো? তাই অনেক ভেবেই আমি—যাক্ কিন্তু হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য যে সব সমাজে সমাজবিধির নিয়ম একটু শিথিল, সেখানের কোন কোন লোকে—"

যে কথাটা নরেশচন্দ্রের জিভের আগায় আটুকাইয়া পড়িতেছিল. সেটা শেষ করিবার প্রয়োজনও হইল না। অকস্মাৎ উচ্চ এবং মর্ম্ম-ভেদিকণ্ঠে. "আপনি এই কথা বল্লেন!—"

এইটুকু বলিয়া উঠিল এবং তারপরই বক্ষবিদ্ধ ঘুরিয়াপড়া পাখীর মত স্খলিতপদে সুষমা প্রায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক চিরিয়া তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তখন একটা উদ্দাম ক্রন্দন ঝরণার মতই বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে যে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতে ছিল না।

নরেশচন্দ্র অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারও বুকের মধ্যে তখন একটা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথার সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের পুরাতন অথচ অ-বিস্মৃত স্মৃতি মনের মধ্যে যেন নূতন হইয়া আবার ফুটিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কহিলা তাপস চাহি মোর মুখে—কোন দেব আজি আনিলে দিবা?
তোমার পরশ অমৃত-সরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

—কাহিনী।

আট বৎসর আগের কথা ;—বর্ষার ঝিপ্‌ ঝিপে বৃষ্টি কাদায় রাস্তা ঘাটের দুর্দ্দশা যেমন হইতে হয় তেম্‌নি হইয়াছে। আকাশে ঘোলাটে, চলনামা গঙ্গার জলের মতই তাহারও যেন কর্দ্দমাক্ত ময়লা রং। সূর্য্যের দেখা শোনা পাওয়াই ভার, রাত্রে চাঁদ তারা যে কত দিনই ওঠেন নাই তার হিসাব ছিল না। এই রকম সময়ে একদিন চাঁপাতলার গলির মোড়ে একখানা মোটর গাড়ী কষ্টে সৃষ্টে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রবেশপথেই তার কল বিগড়াইয়াছিল, সে আর চলিল না। গাড়ীর আরোহী দুজন ইহাতে বেজায় বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ মাদ্রাজী সোফারের সঙ্গে বকাবকি করিলেন ও শেষটায় অগত্যাই নামিয়া পড়িতে হইল।

দুজনের মধ্যে একজন অপর জনকে বলিলেন, "ওহে ননি! আজ আর তাহলে হলো না, চলো ট্যাক্সি নিয়ে সিনেমা টিনেমা কোথাও একটা ঘুরে আসা যাক।"

ননী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কিন্তু তার গানের খ্যাতি শুনে আপনি যে তার গান শুনতে আজ আসবেন, এ খবর আমি তাকে পাঠিয়েছি। ডালিম আপনার জন্য যে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি যে থিয়েটারে তোমার গান রাজা বাহাদুরকে মুগ্ধ করে দিয়েছে!"

'রাজা বাহাদুর' অপ্রসন্ন ভ্রুকুটী করিলেন বলিলেন "তা বলে তো আর কাদা মাখামাখি হয়ে যেতে পারিনে। তা ভিন্ন অত সব বল্‌তেই বা তুমি

গেলে কেন? গান অবশ্য ভালই লেগেছিল, যেদিন হয় তখন একদিন শুন্‌লেই চল্‌তো। বিশেষতঃ ওদের বাড়ী গিয়ে গান শুন্‌তে আমার তেমন প্রবৃত্তিও হচ্ছিল না। এ হয়ত ভালই হলো।"—

আর কি বলিতেছিলেন বলা শেষ হইল না, পথের পাশের কর্দ্দমাক্ত অন্ধকার হইতে, কে একজন বলিয়া উঠিল—বাবু! "বাবু মশাই গানশুনবেন?"

নরেশচন্দ্র কি বলিতেছিলেন ভুলিয়া গিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওই শোন হে ননীলাল! গান শুনবার আবার অভাব কি, যে তার জন্য এই গলির কাদা ভাঙ্গ্‌তে হবে? গান স্বয়ং এসেই আমাদের আমন্ত্রণ করচে!—কই কে গান শোনাতে চাইছিলে গা? এসো না, গান আমি শুন্‌তে রাজী আছি।"

মোটর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অর্দ্ধান্ধকার গলির ওধার হইতে একটি ছোট্ট মেয়ে এধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটীর পরণে একখানি গোলাপী রংএর সন্তোষপুরের ডুরে, গায়ে একটি চলচলে গোলাপী সিল্কের বাজারে কেনা জ্যাকেট, এক হাত কাঁচের ঝুরো চুড়ি, কপালে তেলেজলে চক-চকানো চুলের পাতা নামানো এবং তাহারই নীচে একখানা বড় গুল-পোকার টিপ। বয়স তাহার সাত আট বছরের বেশী মনে হয় না। পাতলা ও অপুষ্ট দেহ, কিন্তু রংটুকু দিব্য ফুটফুটে এবং মুখখানিও সুন্দর।

এই বৃষ্টির রাত্রে জনবিরল অপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে একা এমন সুসজ্জ একটি ছোট বাঙ্গালীর মেয়েকে গান শুনাইতে ব্যগ্রভাবে উদ্যত দেখিয়া নরেশচন্দ্র কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। সাজ পোষাক চেহারায় তাহাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে মনে হয়, ভিখারীর মেয়ে কখনই নয়। তবে এমন করিয়া সে পথের মধ্যে গান শুনাইতে চাহিল কি জন্য—এই কথাই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন। এমন সময় মেয়েটী ঈষৎ একটুখানি সঙ্কোচের

সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! এইখানেই কি দাঁড়িয়ে গান শুনবেন? না আমার বাড়ীতে আসবেন?"

ননী এই কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া কৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "ওহে, রাজা! খুকিমণিটি যে আবার বাড়ীতেও ডাকে হে! ব্যাপারখানা কি?"

নরেশ কিছু ব্যথিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কতদূর? তোমার গান শুন্‌লে তোমাকে কি কিছু দিতে হয়?—না অম্‌নি গান শুনাও?"

মেয়েটীর চোখে জল আসিয়াছে তাহা নিকটস্থ মোটরের আলোয় দেখা গেল, সে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া সেই চোখের জলটাকে দমনে রাখিল ও কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল, "অম্‌নি ত শোনাইনে, পয়সা দিতে হয়।"—ক্ষীণ কণ্ঠে ইহা বলিয়াই তারপর হঠাৎ যেন চমক-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "অ-বাবু! আসুন না, গান শুনবেন, আসুন না। আমি খুব ভাল গাইতে পারি। আপনার দিব্যি—সত্যি বলচি।"

ননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনশ্চ বন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংরাজী ঝাড়িল, "হোয়াট এ লিট্‌ল উইচ সি ইজ!" তারপর সেই মেয়েটিকে বলিল "এই বয়েস থেকেই খুব তো তৈরি হয়ে উঠেছ দেখছি! ঘরে তোমার আর কেউ আছে বল্‌তে পারো, না তুমিই?"

মেয়েটী আবার জলভরা চোখে ঘাড় নাড়িল এবং আবার সেই রকম ঢোক গিলিতে গিলিতে অশ্রুজলে ভেজা অস্পষ্টস্বরে "আমার মা আছে, মার বড্ড ব্যারাম—"বলিয়াই হঠাৎ সে দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "তৈয়ারি" সে যে এখনও হইতে পারে নাই—তাহাই যেন ওই রকমে সে ইহাদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিল।

একটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই নরেশচন্দ্র সকল অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। কি দারুণ দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াই এই কচি বয়সের মেয়েটী আজ কি নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের হস্তে নিজেকে ঠেলিয়া দিতে আসিয়াছে, সেই ভয়াবহ কাণ্ডটা যেন একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার মূর্ত্তিতে নরেশের দুই চোখের সাম্নে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। এই সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত জীবগুলার শেষ দুরবস্থা তাহাদের পাপের ভার প্রায় এই রকমেই ভরাইয়া তোলে। কোন পতিতপাবন যদি নিজে আসিয়া এদের একটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই হয়ত এর একটু সদুপায় হয়! করুণায় একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েটীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কি বেশীদূর? কাছে হয়ত আমি যাব।"

মেয়েটী রুমালে চোখ মুছিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ওই বড় বাড়ীটার একতলার একটা ঘরে আমি আর মা থাকি, দূরে যেতে আমার ভয় করে, আমি পারি না।"

নরেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো।"

সোফার বলিল, "রাজা সাহেব! গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে।"

ননী উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাব করিল, "ওহে, তাহলে এটিকে কিছু দিয়ে ডালিমের ওখানেই যাওয়া যাক্ চলো।"

নরেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকিয়া সঙ্গিনী মেয়েটীকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটী বলতো?"

সে বলিল, "আমার নাম সুষমা। কিন্তু আমায় সব্বাই বেদানা বলে ডাকে।"

"তুমি ক' বছরের?"

মেয়েটী বলিল, "ন' বছরের।"

"নয়! তা কিন্তু মনে হয় না। আচ্ছা গান গেয়ে তুমি রোজ কত করে পাও?"

সুষমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর আবার তেমনি সলিলার্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "এই তিনদিনে এক টাকা বার আনা পেয়েছি, তাতে মার এক শিশি ওষুধ বই হয়নি।"

নরেশ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত-কম কেন? একটা গানে কত নাও?"

সুষমা বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, সে এবার তাহা গোপন চেষ্টা না করিয়াই জবাব দিল, "কত আর নিই, যে যা দেয়। কেউ শুন্‌তেই চায় না, অনেকে এমন ঠাট্টা করে যে আমার গাইতে ভালও লাগে না। আজ তাই সারাদিন আসিনি, এখন মার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—কি করি তাই এলুম। না হলে--"

মেয়েটী আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার ক্ষুদ্র শরীরটুকু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া তাহার অসহ্য দুঃখ জানাইয়া দিতে লাগিল।

পাপের পরিণাম যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও তরঙ্গিনী রোগে রোগে এমন দশা হইয়াছিল যে চোখে সে যেন দেখা যায় না। সেঁৎসেঁতে ঘরের মেজেয় ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ বিছানায় কঙ্কাল মূর্ত্তির মত মা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, গৃহসজ্জার মধ্যে দু' একটি ওষুধের শিশি, একটা জলের ঘটি ও এক পাশে দু' একটা হাঁড়িকুঁড়ি ও ময়লা কাপড় চোপড় পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক দুরবস্থাপন্ন গৃহের মধ্যে গৃহস্বামিনীর কন্যা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, এই ঘরের গৃহবাসিনীর সহিত তুলনায় তাহার সাজসজ্জাকে তখন কত বড় যে কৃত্রিম বলিয়াই বোঝা গেল, সে যেন বাহিরে থাকিতে অনুভবও করা যায় না। মেয়ের সাড়া

পাইয়াই সেই কঙ্কালাবিশিষ্ট মুমূর্ষু তার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রবল তীক্ষ্ণ স্বর বাহির করিয়া বন্ধ জন্তুর অনুপায় হিংস্র গর্জ্জনের অনুকল্পে চেঁচাইয়া উঠিল, "পোড়ারমুখি! অ-পোড়ারমুখি! এরই মধ্যে যে আবার ছুটে চলে এলি বড়? এবার যদি পয়সা না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিস তো এই মরতে মরতে উঠেও খেংরার চোটে পিঠের চামড়া খানা তুলে নেবো জেনে শুনে ঢুকতে আসিস্। পোড়ারমুখী তোর আবার ভদ্দরআনির অত পটপটানি কেন্‌লা শুনি? লোকে ঠাট্টা করলে ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ওরে আমার লজ্জাবতী লতারে! এর পরে খাবি কি করে? দাসীগিরি করলেও যে কোন ভদ্দর লোকের ঘরে তোকে ঠাঁই দেবে না তা জান্‌চিস কিছু?"—

সুষমা ছলছলে চোখে মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুগাঢ়স্বরে কহিল "রাজাবাবু গান শুনতে এসেছেন।"

"ওমা! তাই বল! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, যে আমার মতন দীনের কুটীরে আজ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো! ওমা, ও বেদানা! আসনখানা এনে রাজা বাবুকে পেতে দাও মা, পেতে দাও! আঃ এমন আধমরা হয়েও পড়ে আছি যে, উঠে বসে আপনাদের মতন মহাজনদের একটু সম্বর্দ্ধনা করে নেবো সেটুকুও শক্তি আমার পোড়াদেহে নেই।"

নরেশ ও ননীলাল আসন গ্রহণ করিলেন, সুষমার গানও একটার পর একটা করিয়া তিন চারটে শোনা হইয়া গেল। গলা শুনিয়া নরেশের তো বটেই, এমন কি ননীবাবুরও আর এই সন্ধ্যাটাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল না। গান শুনিয়া নরেশ তরঙ্গিনীকে বলিলেন, "সুষমার এমন গলা ওকে কেন কোন থিয়েটারে দাওনি?"

তরঙ্গিনী ফোঁস করিয়া একটা অলন্ত নিশ্বাস ফেলিল, "দেখুন, রাজা সাহেব! পাপের পথে যতই এগিয়ে গেলুম, পাপের ভারে মন আমার

ততই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সুখ খুঁজতেই বাড়ীর বাইরে এসেছিলাম, খুঁজে দেখলুম,—তার একটা কণাও পেলুম না। আমার সেই কুঁড়েঘরে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, এই বাড়ীর তেতালাতেও তা পাইনি, তাই বড় সাধ ছিল ওকে ও পথে আর যেতে দিব না। ওর গলার জন্যে বছর-খানেক আগে থেকেই ওর জন্যে ওরা দর দিচ্ছিল, আমি বেতে দিইনি। কি মনে করেছিলুম জানেন? আমার সব টাকা দিয়ে ওর জন্যে কোম্পানির কাগজ কিনে দোবো, তার আয়ে ওর খাওয়া পরে চলবে, আর ওকে খুব গান বাজনা শেখাব, বড় হয়ে ও একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলবে, তাই থেকে ওর নামও হবে, পয়সাও হবে, আর ধর্ম্মও থাকবে। তা হলো না। তা হলো না,—ভগবানের ইচ্ছে নয়—তা হলো না।"

নরেশ এই রূঢ়ভাষিণী নিষ্ঠুর প্রকৃতির পতিতা মায়ের মনের ভিতরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার জন্য অনেকখানি সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার টাকা ছিল, তাহলে এমন হলো কেন?"

তরঙ্গিনী বলিল "ঠকিয়ে নিলে মশাই! ঠকিয়ে নিলে! ভদ্রলোক মনে করে শ্যামলাল পাইনের হাতে দশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজ কিনতে দিলুম। সেই টাকা নিয়েই সে ফেরার হলো! উল্টে তার পিছনে পুলিসে ডিটেকটিভে কত রকমে কত টাকাই আমার খরচ হয়ে গেল মশাই! ধনে প্রাণে আমায় সে মেরে গেল! তা যদি ধর্ম্ম থাকেন, তা হলে একদিন ঐ টাকা নেওয়া তার বেরুবে, ওম্‌নি হজম করতে পার্ব্বে না।—" আরও অনেক কটূক্তি সে তাহার নিজের ধনের অসৎ পথের অংশীদারের উদ্দেশ্যে ফোয়ারার মতই উৎসারিত করিয়া দিল। তারপর মনের জ্বালা, গালির বন্যায় অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে পরে, কথঞ্চিৎ শান্ত-ভাবে পুনশ্চ নিজের কাহিনী ফিরিয়া আরম্ভ করিল। অনেক আড়ম্বরে

নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের সবটুকু খবর দিয়া মোট কথা সে এইটুকু জানাইল যে, সেই চৌর্য্য ব্যাপারের পর হইতেই মনের অত্যন্ত আঘাতেই তার বাতজ্বর হয়; তার উপর উকিল বাড়ী, পুলিস থানায় ছুটাছুটি ইত্যাদিতে রোগ বাড়িয়া যায়। উপার্জ্জন বন্ধ,—চিকিৎসার খরচ প্রথমে গহনা, শেষে আসবাবপত্র বেচিয়া চলিতে থাকে। কালের ধর্ম্মে গহনা-গুলায় সোনার ভাগ কমই ছিল, বিলাতি সোনা, পাথর, মতি এই সবই কিনিবার সময় দাম লাগে বেশ, বেচার বেলায় সিকি হইয়া যায়। শেষে বেচিতে বেচিতে যখন সবই ফুরাইয়া গেল কেবল প্রাণটাই বাকি রহিল, ডাক্তারও ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও শুধু পথ্য মেলা পর্য্যন্ত ভার হইল। প্রথম কিছুদিন ধার কর্জ্জ বন্ধু বান্ধবের দয়াধর্ম্মে চালাইয়া—শেষে সে সবও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অনুপায়েই সুষমাকে রোজগার করিতে পাঠাইতে হইল। তাহাকে থিয়েটারে পাঠানই স্থির হইয়াছে, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। কাঁদিয়া উঠিয়া পা জড়াইয়া ধরে, বলে অত লোকের সাম্‌নে গান তাহার গলা দিয়া বাহির হইবে না;—বরং সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পয়সা আনিয়া দিবে, তবু ওখানে যাইতে পারিবে না।

তরঙ্গিনী বলিল, "দেখুন রাজাবাবু! মেয়েটার ঐ কথা শুনে আমারও কি আর বুক ফেটে যায়নি? আমিই তো ওকে সেই একরত্তি বেলা থেকে পাপকে ঘেন্না করতে শিখিয়ে এসেছি। 'আমার পাপ আমার সঙ্গেই বিদায় হোক, ওকে আমার সে যেন কিছুতেই স্পর্শ করে না',—এই যে আমার ঠাকুরের কাছে একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু কি করবো বলুন, পোড়া পেটের দায়ে শেষকালে তাই আমায় করতে হলো। তা আপনি বলুন তো ও রকম ভিখিরির মতন পথে বার হওয়ার চাইতে এখন থেকেই থিয়েটারে ঢোকা ওর পক্ষে ভাল নয় কি? আপনি বরং

দয়া করে ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে একটু বলে কয়ে দেন,—দেবেন কি?"

নরেশ সুষমার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার ভয়ত্রস্ত দুটি চোখের সঙ্গে তাঁহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। সেই শিশুর মত বালিকা-চক্ষের ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিটুকু নরেশের পুরুষ চিত্তকে বিপুলবলে আকর্ষণ করিল। আহা এই কুপথ অনুসরণে একান্ত অনিচ্ছুক এই একান্ত অসহায় জীবনটাকে সে যদি আজ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া যায় তাহা হইলে সে কি ইহার ভবিষ্যতের সমুদয় পাপ এবং তাপের জন্য সম্পূর্ণরূপেই দায়ী হইয়া থাকিবে না? তাহার বুদ্ধি তাহার বিবেক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়, তাহাকে,—শুধু একমাত্র তাহাকেই এই অসহায় জীবটীর সমস্ত দুর্দ্দশার জন্য—এখানে নাই হোক, আর এক লোকের সব চেয়ে বড় দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবেই হইবে। তখন সে বলিবে কি? ঘৃণা করিয়া সে ইহার দিকে চাহে নাই,—এই কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারিবে? ঘৃণা বাস্তবিকই তো ইহাদের তাহারা করে না! তা করিলে ডালিমের গান শুনিতে এই বর্ষার রাত্রে বাহির হইয়াছিল কিসের জন্য? অবজ্ঞায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম,—এমন কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে, লজ্জায় কি মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা করিবে না? তিনি যে এর আসন্ন বিপদের ঠিক সন্ধিক্ষণেই তাহার রক্ষা-হস্তের মধ্যেই এই অনন্যসহায় ভীরু দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তখানি টানিয়া আনিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে ইহার এত বড় দুর্দ্দশার দিনে ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? না সে তাহা পারে না।—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তো নয়ই, অমানুষ হইলেও নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে কদর্য্য সৃষ্ট কাক,—তারাও সহায়চ্যুত কোকিল শিশুকে নিজের কুলায়ে পালন করে, ফেলিয়া দেয় না।

নরেশ একটু পরেই বিদায় লইলেন, আসিবার সময় সুষমার হাতে দশটী টাকা দিয়া তার মাকে বলিয়া আসিলেন, "সময় মত তিনি আবার আসিবেন, তাহাদের খরচ তিনিই দিবেন কিন্তু আজ হইতে সুষমা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে এবং তাঁহাকে না জানাইয়া বাড়ীর বাহির হইতে পাইবে না!"

সুষমার বয়স যদি ন'বছর না হইয়া চৌদ্দ হইত তো তরঙ্গিণী বা ননীবাবু কিছুই বিস্মিত হইত না। তাহা নয় বলিয়াই দুজনেই একটু একটু বিস্ময় বোধ করিল। কিন্তু তখনি কি ভাবিয়া লইয়া পতিতা করজোড়ে কহিল, "কিন্তু আমারও একটি নিবেদন আছে রাজাবাবু! আপনি দেবতা মানেন?"

"কেন?"

"তা হলে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করতে হবে, বেদানাকে আপনি কোন দিনই ত্যাগ করতে পারিবেন না।"

নরেশ শুধু বলিলেন, "আচ্ছা।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গগন ব্যবধান, তবুও মনঃ-প্রাণ, না সঁপি যদি বুক না ফাটে
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,
ভাঙিলে সে স্বপন—মরিতে নার যদি—ব'লনা 'প্রেম' তবে কভু তায়
—তীর্থরেণু

সুষমার মা মাসখানেকের মধ্যেই মরিল। তখন সুষমাকে লইয়া নরেশ একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। পতিতার গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখা সঙ্গত নয়; অথচ থাকেই বা সে কোথা? তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পাইতেছিলেন তাহাতে তাহার প্রতি মমতায় চিত্ত তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়াই উঠিতেছিল. এমন জীবনটী যেমন করিয়াই হোক তাঁহাকে নির্ম্মল করিয়া রাখিতে হইবে; পাঁকের মধ্যে জন্মিলেও তাহাকে পঙ্কজরূপে ফুটিয়া উঠিতে সহায়তা করিতে হইবেই। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবানীপুরের প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়ীখানি তাহার নামে কিনিয়া দিলেন। একটী বুড়া দরওয়ান ও একটী বুড়া চাকর রাখিয়া তিনি সেই বাড়ীতে এই ভিন্ন জগতের মেয়েটীকে এক রকম বন্দীদশাতেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঝি প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াই রাখিলেন না। কারণ, ইহার পরিচর্য্যা করিতে স্বীকৃতা হইবে এমন দরের যে ঝি, অসৎ শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় তাদের মত অল্পই পাওয়া যায়—এই রকমই নরেশের বিশ্বাস ছিল।

সুষমার মায়ের সাধ ছিল মেয়ে সঙ্গীত কলাটা ভাল রকমে আয়ত্ত করিয়া তাহারই চর্চ্চায় ও শিক্ষায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারে। নরেশ-চন্দ্রের ইহা অসঙ্গত ঠেকিল না, এই রকমই একটা কোন পথ ইহাদের

জন্য তোর করিয়া না দিতে পারিলে এদের জীবনই বা আশ্রয় পায় কোথায়? আজকাল তো অনেকেই মেয়ে বউদের গানবাজনা শিক্ষা দিতেছেন, এদের মধ্যে যারা পাপের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুপথে জীবিকার্জ্জন করিতে চায়, তাদের লইয়া যদি একটা সঙ্ঘ তৈরি করা যায়,— অবশ্য বিশেষভাবে পরীক্ষা লইয়া,—তবেই ইহাতে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। তাহারা অন্তঃপুরিকাদের গানবাজনা শিখাইতে পারে। বৈষ্ণবীরা তো অন্তঃপুরে ভিক্ষা লইতে যায়, মিসনরী মেমেদের সঙ্গে যে সকল দেশীয় খৃশ্চান মেয়েরা যিশুর গান গহিয়া ও শেলাইবোনা একটু আধটু শিখাইয়া বেড়ায় তাদের মধ্যেও তো ঢের জিনিষ ছিল, ধর্ম্মশিক্ষার ও সঙ্ঘ-মধ্যের শাসন সংযমতায় তারাও সংযতভাবে চলিতে শিখিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার অধিকার লাভ করিয়াছে। তেমনি এদের লইয়াও যদি একটা কর্ম্মশালা খোলা যায় মন্দ হয় কি? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নরেশচন্দ্র ওস্তাদ রাখিয়া সুষমাকে গানবাজনা ভাল রকমেই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিধন ঠাকুদ্দা তাহার তানপুরা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননী-বাবু হইল হারমোনিয়ম ও এসরাজের এবং একজন বুড়া হিন্দুস্থানী আসিয়া বীন্ শিখাইতে লাগিয়া গেল। ইংরাজী বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও হইল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নরেশচন্দ্র আবর্জ্জনা ঠেলিয়া ফেলিয়া ধূলা ময়লা কাটাইয়া ইহার ভিতরকার খাঁটী সোনাটুকু ধুইয়া বাহির করিতে চাহিতেছিলেন। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে দৈবাৎদৃষ্ট একটী বৃদ্ধ সাধুর প্রতি তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিলে তিনি তাঁহাকে ইহার নিকট টানিয়া আনিলেন। মেয়েটীর ভিতরকার আগ্রহ ও সদিচ্ছা সাধুটীকেও বিগলিত করিল, তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে উহাকে যখন তখন আসিয়া সংস্কৃত পরিচয় করাইতে আরম্ভ করিয়া

মুখে মুখে নীতিশাস্ত্রের অনেক শিক্ষাদানই করিলেন। ইহাকে পাইয়া সুষমা নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল। এমন মহৎ সঙ্গ ও প্রকৃত স্নেহ সে ত কল্পনাতেও কখন পায় নাই।

এদিকে কিন্তু বাহিরে বাহিরে নরেশ ও সুষমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই রটিয়া উঠিতেছিল। নরেশ—অবিবাহিত ধনী ও নিরভিভাবক নরেশ একটা কম বয়সের—সে যে কত কম সে হিসাব রাখিতে কার গরজ পড়িয়া গিয়াছে—মেয়েকে একখানা সাজান বাড়ীতে রাখিয়া তার উপর বিস্তর খরচপত্র করিতেছেন, তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া সেখানে গানবাজনার মজলিস জমাইয়া তুলে;—আবার সে মেয়েও দেখিতে ভাল, গায় ভাল, বাজায় উৎকৃষ্ট!—এসব যোগাযোগের মধ্যে সাধারণতঃ মানবকল্পনা কিসের সন্ধান পাইয়া থাকে! কাজেই চারিদিকে সুষমা সম্বন্ধে যে গুজব রটিল, সে তার বেশ অনুকূল নয়। নরেশের বাকি বন্ধু যারা, তারা ননীবাবুদের প্রতি তীব্র ঈর্ষা প্রদর্শন করিয়া নরেশকেও তাঁহার একচোখোমীর জন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অনুযোগ করিতে থাকিল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া সকলকেই অল্প বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহাদের আন্দাজ একেবারেই ভিত্তিহীন, সুষমা তাঁহার আশ্রিতা। —আর কিছুই নয়। সে নেহাৎ ছেলেমানুষ এবং অত্যন্ত নির্ম্মল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বেশতো, হোক না সে সতীত্বের শ্বেতপদ্ম! আমাদের তাতে তো কোনই আপত্তি নেই। আমরা শুধু তার দুটো গান শুনে আসতে চাই এই বৈতো নয়।"

অগত্যা গান শুনাইতে হইল এবং আরও দুচারবার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পার পাওয়া গেল না। ইহাঁদের মধ্যের দু একজন গূঢ় রহস্য করিয়া সুষমার সঙ্গে কথা কহিতে যাইতেই নরেশ চোক

রাঙ্গা করিয়া চাহিলেন এবং সেই হইতে তাঁহাদের বন্ধুত্বের অবসান হইল। নিজের সম্পত্তির উপরে উঁহার প্রবল আধিপত্যের চেষ্টা বোধ করিয়া বাকি সকলে কদাচ সুষমার গান শুনিতে চাহিলেও, তাহাকে অসম্মানের ভাবে সম্ভাষণ করিতে ভরসা করে না। কিন্তু তবুও সুষমা হঠাৎ একদিন নিজের সম্বন্ধে লোকমতটা ভালরূপেই জানিতে পারিল।

সাধুটি বদরিনাথ চলিয়া গিয়াছেন, সুষমার বয়স এখন ষোড়শ পূর্ণ; ননীবাবু ও হরিধন এখন শুধু সপ্তাহে একদিন করিয়া আসে, বাকি দুজন একদিন অন্তরে। সুষমার মনটা আজকাল বড়ই শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল; নরেশ ইদানীং আর তেমন ঘন ঘন আসা-যাওয়া করেন না। আসিলেও আর যেন তেমন প্রাণখোলাভাবে তাহার সহিত না মিশিয়া চুপচাপ গানের বুলিই শুনিয়া যান এবং গানের শেষে সবার সঙ্গেই, কোন দিন সকলের চেয়ে আগে উঠিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করেন। কে জানে কেন সঙ্গতই হোক আর অসঙ্গতই হোক সুষমার প্রাণ ইহাতে ব্যথিত হয়, তাহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগে।

একদিন সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল। কালীঘাটে মহিলা সমিতি হইল। স্বদেশী সম্বন্ধে কোন ভদ্র মহিলা কি বক্তৃতা করিবেন। নরেশকে পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সে সেই সমিতিতে গেল। সে যেখানে বসিয়াছিল, কমবয়সী কতকগুলি বৌ ঝির সেইখানে সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একজন অপরকে বলিল, "দেখেছিস্ ওর মুখের সঙ্গে আমাদের ছোট বৌদির একটু যেন আদল আসে! কে ভাই ও?"

"জ্যাকেটটির ছাঁট তো বড় সুন্দর! জিজ্ঞেস্ কর্ না কাদের বাড়ীর মেয়ে না বউ?"

"ওমা, বউ কি বলছিস্ লো! সিঁতেয় নাকি সিঁদুর আছে! জান্‌না ভাই—ও কে?"

অবশেষে জানাজানি হইল। সুষমা উহাদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত হইয়া স্বীকার করিল, তার বিবাহ হয় নাই, তার বাপকুলের কেহ নাই। তার বাপের নাম জিজ্ঞাসায় সে নিরুত্তর রহিল। তারপর কার কাছে থাকে জিজ্ঞাসায় সে যখন বলিল, একাই থাকে, তখন সেই তরুণী মেয়েরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। একটী মেয়ে বুদ্ধি করিয়া প্রশ্ন করিল "তোমরা কি ভাই ব্রহ্মজ্ঞানী? তাদের ঘরের মেয়েরা মেমেদের মতন পড়াশোনার জন্যে বোর্ডিং টোর্ডিং-এও তো থাকে শুনেছি। সেই রকমই কি এখানে এসেছ?"

সুষমা ম্লান ও বিপন্নভাবে ঘাড় নাড়িল।

এই সময়েই একটী প্রৌঢ়া উহাদের কথাবার্ত্তায় একটুখানি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া সুষমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখি কার পরিচয় শোধান হচ্ছে! ওমা! এ যে ওই 'সুষমাকুটীরে'র সুষমা গো! অবাক্ কল্লি তোরা। ও আবার নিজের পরিচয় কি দেবে তোদের শুনি? চল্ চল্ ওদিকে গিয়ে বস্‌বি চল্। ছুঁড়িগুলোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! হরিবলো মন!—"

নিজেদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা কোথায় ঘটিয়াছিল ভালমতে বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে ঘটিয়াছে সেইটুকু বুঝিয়া লইয়া সেই অনুসন্ধিৎসাপরায়ণা তরুণীর দল দুম্‌দাম্ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে অলঙ্কার বাজাইয়া সভামণ্ডপের অপর প্রান্তে চলিয়া

যাইতে যাইতে পূর্ণ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "কেন গা! ওকে কি আপনি চেনেন?"

প্রৌঢ়া হাতমুখ নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওমা, তা আর চিনিনে? ও যে কোথাকার এক খেতাবী রাজার রাখা মেয়েমানুষ। ওর সঙ্গে কি আর ভদ্দর ঘরের মেয়েদের কথা কইতে আছে মা?"

সুষমার মনে হইল, তাহার চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। আলোকময় জগৎ যেন তমসাবৃত হইয়া গেল।

নরেশচন্দ্রও কিছুদিন হইতে এই সম্বন্ধীয় জ্বালা নেহাৎ কমও ভুগিতেছিলেন না। বন্ধু বান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুহৃদ্ ও হিতকামীর দলও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর ভৎর্সনাপূর্ব্বক এই সর্ব্বনেশে নেশার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। দেশ হইতে বিমাতা হঠাৎ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার মর্ম্ম এইরূপ—বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম তুমি একটা পতিতার সঙ্গ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছ, তাহার পায়েই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছ, তাকে রাণীর বাড়া করিয়া রাখিয়াছ। এ সব কি ভাল? অবশ্য তোমাদের মত বড় লোকের ঘরে সবই সাজে, তথাপি বিবাহ না করিয়া শুদ্ধমাত্র হীনসঙ্গে কাটাইলে চলিবে কেন? বংশরক্ষা করা ত চাই। ও সব যা আছে থাক্; তা না হয় এর সঙ্গে একটী বউ আন, সব গোল চুকিয়া যাক্। যদি তোমার মত হয় আমার বোনঝি চামেলীর সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করি। চামেলীকে ছোটবেলায় বোধ করি দেখিয়াছ? বড় হইয়া আরও সুন্দরী হইয়াছে। দিব্য ডাগর মেয়ে, তোমার সঙ্গে অসাজন্ত হইবে না।

এই চিঠি পাইবার পর নরেশের দ্বিধাগ্রস্ত মন যেন সম্পূর্ণরূপেই তাহার নূতন চিন্তাধারারই অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে স্থিরসঙ্কল্পে

দৃঢ় হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুষমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ধ্যাবেলায় একাকিনী সুষমা বসিয়া অর্গানের বাজনার সঙ্গে নিজের মধুর কণ্ঠের যোগ করিয়া গাহিতেছিল—

"ওহে জীবনবল্লভ! ওহে সাধব-দুর্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু নীরবে যাব, হৃদয়ে লয়ে প্রেম মূরতি তব।—"

হঠাৎ খুব কাছেই জুতা-পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেশচন্দ্র।

তৎক্ষণাৎ বাজান বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়িতে গেল। মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

নরেশ ব্যগ্র হইয়া বারণ করিলেন, বলিলেন, "বেশ মিষ্টি লাগছিল, জান তো গান শুনতে' আমি বড় ভালবাসি। যা গাচ্ছিলে গাও, আমি শুনি।"

সুষমা আজ্ঞা পালন করিল। গাহিতে তার উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হইল। সে গাহিতে লাগিল—

সুখ দুঃখ সব ত্যাজ্য করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা দিবে তাহা মাথায় তুলে লব।"

গান থামিলে তাহার দিকে—একটু নত হইয়া নরেশ কোমলকণ্ঠে কহিলেন—"নিজে হাতে 'যা' দেব, তা মাথায় তুলে নেবে কি? 'তোমার মর্ম্মের কথা' আমি না জানি তা' নয়; আজ 'আমার মর্ম্মের কথা' আমি তোমায় জানাতে এসেছি, তুমি শুনবে কি বেদানা?"

সুষমা এমন সুর ইঁহার কণ্ঠে কোন দিনই শুনে নাই। আর এই সব কথা! সে ত্রস্ত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

নরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন ও তাহার দৃষ্টি হইতে নিজের চোখ সরাইয়া লইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুষমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেশ দেখিলেন সে হাত দুখানা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি দুই হাতে তাহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"অনেকদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি, দূরে সরে যাবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম, পার্‌লাম না, তুমিও তো আমায় ভালবাস—আমার হও। আমি তোমায় চাই।"

সুষমা জোর করিয়া তাঁহার হাতের মধ্য হইতে নিজের মুখ ছিনাইয়া লইয়া পিছু হটিয়া গেল, বারেকমাত্র তাহার শান্ত, সন্ধ্যা-তারার মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি দীপ শিখার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ললাটের শিরা সকল স্ফুরিত হইয়া ধূমকেতুর মত দেখা-দিয়াছিল, কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই অসহায় ও অবসন্নভাবে নরেশের পায়ের তলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে দুটী হাত জোড় করিয়া বলিল—

"আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য আমার নাই; কিন্তু ইহলোকে আপনিই যে আমার একমাত্র আশ্রয়—আমার দেবতা! আপনার প্রতিও শ্রদ্ধা হারালে কি নিয়ে আমি বাঁচবো আমায় তাই বলুন?—"বলিতে বলিতে থরথর করিয়া বায়ুতাড়িত পুষ্প-পল্লবের ন্যায় দুখানি ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পাতায় জমা শিশিরের মত ঝরিয়া পড়িল।

নরেশ তাহার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নিতান্ত দুঃখিতভাবে

কহিয়া উঠিলেন, "তুমি আমায় ভুল বুঝেছ বেদানা! তেমন করে তোমায় আমি পেতে চাইনি। আমি স্থির করেছি তোমায় আমি বিয়ে করবো।"

বিদ্যুৎছটার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুষমা উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "আপনি আমায় বিয়ে করবেন! আমাকে! নিশ্চয়ই আপনার মাথার ঠিক নেই; কিম্বা—"

নরেশ মনের মধ্যে ঈষৎ লজ্জানুভব করিলেও তাহা গোপন রাখিয়া সপ্রতিভভাবেই হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি পাগলও হইনি, নেশাও করিনি, সহজ স-জ্ঞানেই এই প্রস্তাব করচি এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে,—তা আর বদলাবে না।"

শুনিয়া সুষমার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সে তাহার শানিত ছুরিকার মতই উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নরেশের আবেগময় নেত্রের উপর স্থির করিয়া তেমনি নির্ম্মমকণ্ঠে জবাব দিল—"কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই। আমি আপনার স্ত্রী হতে চাইনে।"

নরেশের মুখের ছবি বিস্ময় ও বেদনাহত হইয়া উঠিল "সে কি!—সুষমা! তুমি কি আমায় তবে ভালবাস না?"

বন্দুকের গুলি খাইয়া ছোট পাখীটী যেমন ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়াই মুহ্যমানা সুষমা আবার নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়া বসিয়া পড়িল। অনাহত চোখের জলকে প্রাণপণে রোধ করিতে করিতে অর্দ্ধব্যক্তস্বরে সে কহিল, "আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কিনা ভগবানই জানেন! কিন্তু জ্ঞানতঃ আমার শরীর মন দিয়া এজন্মে আমি কোন পাপই করিনি, তাই মনের মধ্যে আপনার পূজো করাকে আমার পক্ষে দুঃসাহস বোধ করিলেও তাতে পাপ করেছি বলতে পারি না। আপনি আমার দেবতা,—আমার দেবতারও বাড়া—আমার ঈশ্বর! আপনাকে মিথ্যা আমি কেমন করে বলবো? কিন্তু যদি কখন

জন্ম বদলে আবার মানুষের দেহ—মেয়েমানুষের দেহ—পাই, তবেই তা আপনাকে দিতে পারবো। কিন্তু এ পাপ দেহ—আমি বরং একে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো,—তবু আপনার পায়ে দিতে পারবো না।"

নরেশচন্দ্র এই গভীর বেদনাপূর্ণ আত্ম প্রকাশে গভীরতর সহানুভূতি ও ব্যথানুভব করিলেন। নত হইয়া সুষমার একখানি হাত হাতে লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ আদরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "তোমার দেহ পাপ দেহ কিসে সুষমা? কোন পাপই তো এ শরীরে তুমি করোনি, তবে কেন অন্যের পাপের কলুষে নিজেকে তুমি ময়লা করে দেখচো? জন্ম সম্বন্ধে তোমার হাত ছিল না, সেজন্য তুমি দায়ী নও। তোমার যা সাধ্য তাতে তুমি উচ্চ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছ!"

সুষমা নিজের হাত যথাস্থানেই বদ্ধ থাকিতে দিয়া মর্ম্মপীড়িতের ব্যাকুল বেদনার সহিত তীব্র বিলাপপূর্ণ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনি ভুল করচেন! আমার এ দেহ পাপ প্রসূত, পাপ পুষ্ট, এই শরীর দিয়ে আমি আর সব হতে পারি, শুধু গৃহস্থের বউ, আর—"সুষমা নীরব হইল!

নরেশ তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া অধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আর?"

জোর করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া সুষমা নতচক্ষে উত্তর করিল,—"সন্তানের মা হতে পারি না। সমাজের বাইরে দেশের দশের ধর্ম্মের কর্ম্মের আর আর অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আপনারা আমাদের নিয়োগ করে আমাদেরও বাঁচান আর নিজেরাও বেঁচে থাকুন, শুধু ড্রেনের মধ্য থেকে তুলে অন্তঃপুরে নেবেন না; কার মধ্যে কতখানি বিষ যে থেকে যায় তার কি কিছু স্থিরতা আছে!"

নরেশ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহা লক্ষ্যে সুষমা আরও একটু জোর দিয়া দিয়া বলিতে লাগিল—"যেমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী বা পুরুষের

বিবাহ করা অনুচিত, এবং দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্তদের বিয়ে করা মহাপাপ, তেমনি আমাদেরও এই বিষাক্ত শরীরের রক্ত দিয়ে জীব সৃষ্টির মত মহাপাপ আর সংসারে কোন কিছুই নেই। আমার মায়ের রক্ত আমার মেয়ের মধ্যে যদি—"

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুষমা দু হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।—"আর বলবেন না, আমি পারচি না, হয়ত দুর্ব্বল সামান্য স্ত্রীলোক লোভে পড়ে যাব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আমার রক্তের দোষে হয়ত—হয়ত—হয়ত ঐ পাপপথে ঐ হীন বৃত্তিতে—ওঃ ভগবান! ভগবান! এমন যেন না হয়।"

সুমার সুগভীর হতাশার মর্ম্মান্তিক বিলাপ, মর্ম্মের একান্ত প্রাণ-ফাটা অসহায় আর্ত্ততার মধ্যে মিশিয়া অস্ফুট হইয়া গেল। দুহাত-দিয়া-ঢাকা মুখ সে নিজের দুই জানুর মধ্যে লুকাইল।

সুষমা চাহিয়া দেখিল না; কিন্তু তাহার অঙ্কিত এই ভয়াবহ চিত্র নরেশের বুকের মধ্যেও বোধ করি একটা সংশয়ের আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার এতক্ষনকার সতেজ দৃষ্টি ও প্রসন্ন ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া এক্ষণে তাহার স্থলে কেমন যেন একটা সন্দেহাকুল চলচ্চিত্ততা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কতক্ষণই এইভাবে কাটিয়া গেল। দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙ্গান ছিল। তার পেণ্ডুলেমটা একটা ভ্রমরের গঠনের, একটা পদ্ম ফুলের কাছে সেই ভ্রমরটা ক্রমাগত ডানা মেলিয়া আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু যেন প্রত্যাখাত হইয়া হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারই ব্যাকুল আবেদনের সুরে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল।

তখন যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়া নরেশচন্দ্র সুষমার দিকে চাহিয়া ডাকিলেন "বেদানা!"

"আজ্ঞে।"

"কিন্তু সুষো! ছুটো জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটা কি একেবারেই তুচ্ছ করবার? এ বিয়েতে আমরা দুজনেই কত সুখী হতেম সেটাও ভেবে দেখ।"

সুষমা হয়ত এই কথাটাই তখন ভাবিতেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে ইহার জবাব দিল,—"এ বিয়েতে আপনাকে স্বজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে হবে, সমাজে হেয় হতে হবে,আর তা ছাড়া সবচেয়ে বড় যা' তাতো আগেই বলেছি। এ অবস্থায় সে সত্যকার ভালবাসে, সে কি কখন সুখী হতে পারে?—না মরে যায়? কেমন করে জানলেন যে দুজনেই সুখী হবো?"

"তাহলে কি তোমায় চিরদিনই এই অমর্য্যাদার মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য বলে তুমি স্থির করচো?"

"আমার জন্মই যে এই অমর্য্যাদার মধ্য দিয়ে, আপনি কি তা এত করেই বদল করতে পারলেন—যে আরও আশা করচেন? লাভে হতে এখন যেটাকে 'পুরুষোচিত দুর্ব্বলতা' বলে লোকে আপনাকে করুণার সঙ্গে মাপ করে চলে, তখন তা করবে না। আর আমি? আমি লোকের চোখে যেমন আছি তাই থাকবো। শুধু তারা ঘৃণার সঙ্গে এই কথাই বলে আমার সান্নিধ্য ছেড়ে সরে যাবে যে ওটা এতদিন রাজা নরেশচন্দ্রের নরেশচন্দ্রের—" যে লজ্জাকর শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল না, তাহার দুশ্চেষ্ট অধ্যবসায় হইতে উহাকে মুক্তি দিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কথাই হয়ত ঠিক।"

সুষমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আর একটী ভিক্ষা চাইবো?"

নরেশ শুধু ম্লানমুখে চাহিয়া রহিলেন. কোন প্রশ্ন করিলেন না।

সুষমা কহিল, "আপনাকে খুব শীঘ্র বিয়ে করতে হবে। আর যত দিন না আপনি আপনার সেই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন, ততদিন আমায় দেখা দেবেন না।"

নরেশ গভীরতর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচনপূর্ব্বক ভারাক্রান্তচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আচ্ছা।"

দুজনে পাশাপাশি অর্দ্ধ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাত্রি তখন গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উঠানভরা চাঁদের আলো যেন থমথমে নিঝুম হইয়া আছে। অঙ্গনের এক পার্শ্বে পেয়ারা গাছটায় একটা পাখী সেই প্রস্ফুট চন্দ্রালোককে দিবালোক ভ্রম করিয়া ঘুমভাঙ্গা ভাঙ্গাগলায় মিনতি করিয়া বলিতেছিল—"বউ কথা কও! বউ কথা কও!—"

বহির্দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সুষমা দাঁড়াইয়া পড়িল, নরেশচন্দ্র নিতান্ত বিমনা থাকিলেও তাহার এই আকস্মিক অচলতা তিনি অনুভব করিলেন। চলা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া সুষমা হঠাৎ কান্নাধরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "অত্যন্ত লোভ হলেও বড় হয়ে অবধি কখনও আপনাকে স্পর্শ করে আপনার পায়ের ধূলো আমি মাথায় নিতে সাহসী হইনি। শুধু আজকের মতন একটীবার আমায় সেই অধিকারটুকু নিতে দিন।"

এই বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে উপুড় হইয়া উঁহার দুই কম্পিত পায়ের উপরে মাথা রাখিল এবং বিলম্বে সেখান হইতে নিজের মাথার চুলে মুছিয়া জুতার ধুলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিতে চেষ্টাও করিলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

তারপর তিন বৎসরের পরে এই দেখা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু নিরাশা হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবে না, হায়, তেমন রাত্রি নাই।
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে, হ'য়ো না গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক, তিনিই চালান চন্দ্র তারা।
রেখো ভালবাসা সবার লাগিয়া ভাই জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মত প্রভা দান করো, জনে, জনে, ঘরে, ঘরে।

—তীর্থরেণু

কলিকাতা মহানগরী এক্ষণে সুপ্তিমগ্ন। সেই নিয়ত কর্ম্ম কোলাহল-ময়ী রাজধানীর মধ্যে এক্ষণে কদাচিৎ একটা শব্দ শোনা যায়। পথ প্রায় জনহীন; ভাড়াটে গাড়ী ক্বচিৎ একখানা ষ্টেশনের পথে বাহির হইয়াছে, অথবা ফিরিতেছে। একটা মাতাল কোথাও স্খলিতপদে গ্যাসপোষ্টে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। দু'একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী এবং হাতের 'বেটন' এক আধ বারের মত রাস্তার উপর দেখা গেল, তাহার জন্য কিন্তু গলির মধ্যের কোকেনের দোকানে কোন ব্যস্ততাই দেখা গেল না।

বড় রাস্তার উপরকার প্রায় সকল দোকানই বন্ধ, একখানা ময়রার দোকানের সামনে তখনও আলো জ্বলিতেছে এবং ভিয়ান তখনও বন্ধ হয় নাই তার তাড়ু চালানর খরখরানি শোনা যাইতেছে। কোন সময় হয়ত একখানা চলন্ত মটর সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে থিয়েটার ফেরৎ নরনারীদের হাস্যকৌতুক অকস্মাৎ একবার যেন অন্ধকারের বুকে আলো ঠিকরাইয়া পড়ার মতই উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিল। কদাচ পকেটে ষ্টেথিস্‌কোপ রাখিয়া কোন ডাক্তারবিশেষ কোন রোগীর জন্য আহূত হইয়া ছুটন্ত মটরে বসিয়া আছেন দেখা গেল।

বড় বড় সাহেবী হোটেলের ও দেশী বিদেশী থিয়েটার বাড়ীগুলার সাম্‌নে গাড়ী মোটর কতকগুলা করিয়া তখনও জমিয়া আছে। উর্দ্দিপরা আর্দ্দালীরা সোফারের পাশে বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুনীবদের দল আহার অথবা বিহারে মত্ত, তাঁদের কাছে রাত্রির খবর পৌছিতেছে না; দুরবস্থার একশেষ এই গরীব ভৃত্যের জাতির। তাদের রাত নির্জ্জন পথের ধারেই পোহাইবার উপক্রম করিতেছিল।

আরও এক জায়গায় কিছু আলো, কিছু শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। একটু বড় রকম বাড়ীর সাম্‌নে সাম্‌নে এক আধখানা গাড়ী মোটরও দাঁড়াইয়াছিল। সেগুলা ইংরাজ বাঙ্গালী মাড়ওয়ারি ভাটিয়া সকল জাতির।

গঙ্গাতীরে এখন কল কারখানা ও ষ্টীমার ষ্টীমলঞ্চের ঝক্‌ঝকানি ফোঁসফোঁসানি সব নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই তীরের বড় বড় আফিস বাড়ীর জানালা দরজা সব বন্ধ, নিরালোক এবং স্তব্ধ। সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যগুলা তাদের বিপুল দেহগুলাকে যেখানে সেখানে মেলিয়া দিয়া ঘুমে এলাইয়া পড়িয়া আছে। কে জানে কখন বাঁশীর উর্দ্ধস্বরে সারা সহরকে চকিত করিয়া দিয়া জাগ্রত হইবে!

নিরঞ্জন এই সমস্ত দীর্ঘ পথ নীরবে অতিবাহিত করিয়া আসিল। এক পাশে বিপুলায়তন গড়ের মাঠ, হীরক ও মরকত মণির মালা গলায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে। 'অপ্সরজাতীয়' নরনারীর রূপের আলো, পোষাকের চমক সেখানে আর ছিল না। 'ইংরাজের স্বর্গোদ্যান' স্তব্ধ স্থির। 'কিন্নরের', কণ্ঠরব আর তথা হইতে শ্রুত হইতেছিল না।

গন্ধর্ব্বলোকের সকল জাঁকজমক ঘুমের কোলে চাপা পড়িয়াছে। কেবল জলের বুকে জাগিয়া আছে শুধু নৃত্যশীল তারার মালা, আর একখানা মহাজনী নৌকার বুকে জাগিয়া জাগিয়া একটা চাটগেঁয়ে মাঝি তাললয়বিহীন এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃজন-তৎপর হইয়াছিল। নিরঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেই গীত সুধা উপভোগ করিল—

"এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে, চাঁদের হাট মিলাইত গো—
সেরূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো ও—ও—ও—।"

রস ইহাতে যতই থাক না থাক, নিরঞ্জনের অন্তরের পিপাসা অকস্মাৎ যেন তাহাতেই ভরিয়া উঠিল। ওই যে পশ্চিম বঙ্গের নিকটে অনাদৃত উপহসিত উহাদের পক্ষে একটুখানি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এই জনসম্পদশূন্য নিঃসঙ্গ রাত্রে ওই নিরক্ষর মাঝি নিজের মনের ভাবটী—কাহারও কাছে নয়, শুধু নিজের কাছেই প্রকাশ করিতেছিল; নিরঞ্জনের বোধ হইল উহার ভিতর দিয়া সে যেন সাহেবের আফিস হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে। এই উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য, এই শব্দ বিকৃতি, এ যে তার বুকের মণি, এই যে তার মায়ের দান। সে কাঙ্গালের মত উৎকর্ণ হইয়া রহিল কিন্তু গায়কের তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর শুধু 'রহিয়া রহিয়া' ঐটুকুকেই ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল। গান আর অগ্রসর হইতে পাইল না।

নিরঞ্জন কিনারায় কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। ততক্ষণে চাটগেঁয়ে মাঝির সঙ্গীত-সাধনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণভাবেই সমুদয় বিশ্বচরাচর নিঝুম নিস্তব্ধ এবং নিদ্রিত। ভোরের আলো লাগিয়া আকাশের তারাগুলা শুদ্ধ যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। গঙ্গার জল মূর্চ্ছাতুরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

নিরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল, আপনাকে আপনিই বুঝাইতে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, “কিছুতেই ভুলতে পারচিনে কেন? অথবা নাই বা ভুল্লেম, মন কেন আমার স্থির হচ্চে না? আমি তো তার অহিতাকাঙ্খা করিনি, তার ভালই চেয়েছিলেম, আমার জন্য— আমার সেবা করতে গিয়ে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে গেল, এতে আমার তো কোন হাত ছিল না? তবে কেন নিজেকে তার হত্যাকারী বলে মন আমার নিজের কাছেও মহাপাপীর মনের মতন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে? জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে? চারিদিকে কেবল সেই ছায়া—সেই ছায়াই কেন দেখ্‌ছি? তার কণ্ঠ নিয়তই কেন আমার কানে বাজ্‌চে? একি হলো আমার? কালীপদ! ভাই! বন্ধু! তোমার শেষ অনুরোধ রাখতে পারিনি বলেই কি এমন করে পাগল হয়ে যাচ্ছি? চেষ্টা তো করেছিলুম, বিয়ে করবো, সুখে যথাসাধ্য রাখবো সেই ইচ্ছাই তো ছিল, পারলুম না সে কি আমার হাত? তবে কেন আমার এ দণ্ড? সব তো হারিয়েছি—নিজেকে শুদ্ধ, তবে শুধু তাকেই দেখি কেন? এবার আর স্বপ্ন নয়! বাস্তব মূর্ত্তি ধরেই যে সে আমায় দেখা দিচ্চে। কিন্তু—কি কুৎসিত, কি জঘন্য, কি সঙ্কটের পথ দিয়েই তার ছায়া আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে! ওঃ কার মধ্য দিয়ে,—কার! আর কি কোন রাস্তা সে পেলে না? নাঃ, আর সইতে পারচিনে! পালিয়ে তো এসেছি, আর ফিরবো না, একেবারেই পালাই। কোন্ দিন হয়ত কি বলেই বসবো। নিজেকে তো আমার বিশ্বাস কত! না হলে আমি—এই আমি— এই ডবল অনার নিয়ে বি এ পাশ, ফাষ্ট ক্লাশ এমে—

অঁ্যা—এই কি সেই আমি? নাঃ, নিশ্চয় না। নিশ্চয় সেই আগের আমি মরে গেছি। এ তার—কে?—”

নিরঞ্জনের প্রতি লোমকূপটী পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ অবোধ শিশু যেমন ভূতের ভয়ে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, তেম্‌নি করিয়া নিজের সঙ্গকে সে একান্ত ভয়ে অসহ্য বোধ করিয়া যেন নিজের কাছ হইতে পালাইতে চাহিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিতে আরম্ভ করিত, হঠাৎ তাহার কানে যেন দৈববাণীর মতই কোথা হইতে সেই বিজন নদীপুলিনে এক মানবকণ্ঠের স্বর লহরী ভাসিয়া আসিয়া ঠেকিল। আকুল হইয়া কান খাড়া করিতেই বোঝা গেল, সে একটা গান এবং নদীতীরেই, তাহার নিকট হইতে সামান্য একটুখানি দূরে থাকিয়াই কেহ সে গান গাহিতেছে। বংশীরবাকৃষ্ট সর্পের মতই সে সেই শব্দ লক্ষ্যে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে, শব্দ হইতেছিল কল কল কল। জল কিনারায় অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসিয়াছে, স্রোতের মুখে দূরগামী পণ্যবাহী কয়েকখানি নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাদের দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ছপাৎছপ্। নিরঞ্জনের ভয়ার্ত্ত বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া একটা আশ্বাসের আর্ত্তশ্বাস উঠিয়া পড়িল।

গান গাহিতেছিল একজন স্ত্রীলোক এবং ওই বিদ্যায় কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নিরঞ্জন স্পষ্টই বুঝিল এ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট দখল আছে। সে গানটা এই—

"যে জানে আনন্দময়ী! তোমাকে।
ও সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে।
যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদের নাই কুল,—
তারা জানে না যে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল;—
সংসার নিরানন্দের ফুল—
শেষে আনন্দময় ফল পাকে।"—

নিরঞ্জন এক পা এক পা করিতে করিতে কোন্ সময় একবারে ইহার গায়েব কাছ গিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটী ইহার সঘন নিশ্বাসের শব্দে বারেক চাহিয়া দেখিল; তারপর ঘাড় ফিরাইয়া হাত দশেক দূরের একটা গাছ তলায় তাহার বিশ্বাসী দ্বারবানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে যে গান গাহিতেছিল তাহাই গাহিতে থাকিল। নিরঞ্জনকে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় নাই। সে গাহিল—

"বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে,
ওমা, বিপদ নৈলে জন্মান্ধ জীব ডাকে না তোরে;—
মা, তোর করুণার ফল, বিপদ কেবল, জাগায় অবোধ বালকে।"—

এ গান শুনিয়া নিরঞ্জন চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আচম্কা বলিয়া উঠিল, "একি সত্যি কথা, না খালি গান?"

মেয়েটী গান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি সত্যি কথা বাবা?"

কম বয়সী মেয়েটীর মুখে এই গম্ভীর সম্বোধনটী তাপদগ্ধ ছন্নছাড়া নিরঞ্জনের আরও মিষ্ট লাগিল। সে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিয়া আবার ছেলে মানুষের মতন প্রগল্‌ভ প্রশ্ন করিয়া বসিল। "ওই যে বল্লেন, 'বিপদ সম্পদের তরে', একি সত্যি?"

নারী কহিল, "হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি।"

নিরঞ্জন কহিল "আপনি কখনও বিপদে পড়ে কি এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পেরেছেন?"

সে কহিল, "পেরেচি বই কি! বিপদ সঙ্গে করে নিয়েই তো আমি জন্মেছিলুম, কিন্তু দিনকের দিন যত বিপদ ঘন হয়ে এলো, ততই সম্পদও নিকটতর হতে লাগ্‌লো। শেষে যখন সর্ব্বনাশ এসে

আমায় গ্রাস করতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনি সময়ে একেবারে তিনি নিজে ছুটে এসেই আমায় কোলে তুলে নিলেন। এই যে গাইচি শুনুন না।"—

এই বলিয়া সে পুনশ্চ গাহিতে লাগিল—

"পড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাধে,
যখন কাতর প্রাণে, কুসন্তানে মা' বলে কাঁদে—
তখন, ত্বরায় গিয়ে কোলে নিয়ে, স্তন্য সুধা দাও তাকে ;
মাগো, তবে আর এ সংসারে আনন্দ নাই বলে কে ?"

নিরঞ্জন নিস্পন্দ হইয়া গান শুনিল, তারপর বিমোহিতভাবে সে ঐ অপরিচিতা মেয়েটীর দিকে মুখ ফিরাইয়া উহাকে বলিল, "তোমায় আমার মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করচে! মার মতন তুমি আজ আমাকে, যে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলুম, সেই মহাশিক্ষার মধ্যে হাতে ধরে টেনে এনে দিলে।"

মেয়েটী জোড়হাত নিজের কপালে ঠেকাইয়া জবাব দিল, "'মা' হবার যোগ্যতা আমার একটুও নেই ; তবে আপনি আমার বাবা হলেন। তা নিজের মেয়েকেও তো লোকে আদর করে 'মা' বলে, সেই হিসেবে আমায় আপনি 'মা'ই বলবেন। আমার নাম সুষমা। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক একদিন এখানের খোলা হাওয়া আর আমার বড় মায়ের রূপ দেখতে আসি। থাকি কিনা আদি গঙ্গার ছোট্ট মা-টীর বুকে। আপনিও হয়ত আমার মতই উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছেন? আপনাকে আমার কিন্তু বড্ড ভাল লাগছে! হলে কি হয়, সকাল হয়ে এ'ল, আপনি এখন বাড়ী যাবেন তো? আমিও তাহলে এখন বাড়ী যাই।"

নিরঞ্জন মুগ্ধ হইল, একটু যেন সে তৃপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল,

"তুমিও খুব বিপন্ন হয়েছিলে বল্লে না? তোমার কথার ভাবে বোধ হলো আজও তোমার সে বিপদের মেঘ সম্পূর্ণ কাটেওনি। কিন্তু তুমি তো বেশ শান্তভাবেই সব কথা বল্‌চো,—সংসারকে শ্মশানের পরিবর্ত্তে আনন্দ-কানন বলেও উল্লেখ করতে তোমার বাধছে না! আমি যে তা ভাবতেও পারিনে।"

সুষমা বলিল, "দেখুন, আনন্দ তো বাইরে পাবার জিনিষ নয়, আর কুড়িয়ে বেড়াবারও বস্তু নয়। ওটাকে নেই নেই ভাবতে ভাবতে ওটা একেবারেই মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। আর আছে আছে জপ করতে করতে নিজের মনের মধ্য থেকে সে সহস্রদলে বিকশিত হয়ে ওঠে। আমার সাধুজী আমায় এই রকম করেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আহা, আবার যদি আমি তাঁকে ফিরিয়ে পেতুম! সংসারে কতই যে শেখবার রয়েছে। কিছুই তো শিখতে পেলুম না। ছার মেয়ে হয়ে জন্মে-ছিলুম, তাও আবার একবারেই অধমের চেয়েও অধম হয়ে!"—

ভোর না হইতেই কলিকাতা মহানগরীর নিদ্রাভঙ্গ সাড়ম্বরেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকজন গাড়ী ঘোড়া মটর রিক্‌সা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। এখানে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁটাইতেছে, ওখানে আবর্জ্জনার স্তূপ বোঝাই হইতেছে। দোকান ঘরের দরজা জানালা খটাখট খোলা হইতেছে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা আসা যাওয়া করিতেছে। রাতভিখারীরা ঘরের পানে এবং ভোরের কীর্ত্তন গাহিয়া বৈরাগী বৈষ্ণব বা বাউলেরা ফুটপাথের উপর চলাচল করিতেছিল। ফলের ঝুড়ি, মাছের বাজরা মাথায় লইয়া ও দুধের ভার কাঁধে বহিয়া মুটেরা বাজারের দিকে চলিয়াছে। নিরঞ্জনকে এত ভোরে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া রাজবাড়ীর দ্বারবানেরা কিছুই বিস্ময় বোধ করিল না। এ বাড়ীর সবাই জানে সে পাগল।

——•:•:•——

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাসি খেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি করে তোমায় দিব ফাঁকি।
বুকে আমার যে সুর বাজে, গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাঝে
ভেবেছিলাম সুখের সাজে রাখব তারে ঢাকি।
—৺ইন্দিরাদেবী

পড়াশোনা চুকাইয়া দিয়া নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করিতে করিতে একদিন পরিমল হঠাৎ চমকভাঙ্গা হইয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে নরেশের মুখ আজকাল বেজায় গম্ভীর হইয়া আছে এবং তিনি ইদানীং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরিমল যুক্তি দিয়া স্থির করিল যে ওটা ঠিক বৈরাগ্য নহে, ক্রোধই হইতেছে উহার উচিত অভিধান। নিরঞ্জনের ছাত্রাবস্থা হইতে ছুটী লওয়ায় তিনি তাহার উপর এবার একটু বিশেষ ভাবে চটিয়াছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ তিরস্কারকে সে অত্যাচার বোধ করিয়া মনে মনে নিজেও রাগ করিত, অভিমান করিত; কিন্তু তাহার নিছক ভয় ছিল তাঁহার ওই নিস্তব্ধ ক্রোধের মৌন অভিনয়কেই। সে জানিত, মনের ভিতর হইতে রাগ না করিলে তেমনটা প্রায়ই ঘটিত না। যেহেতু সমস্ত উদার স্বভাবের লোকের মতই নরেশের মনে বড় অল্পেই আঘাত লাগে। পরিমল ভয় পাইল।

'কর্ণধার' প্রেসের ম্যানেজার গাদাখানেক কাগজপত্র লইয়া আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব তর্কাতর্কি করিয়া এই সবে মাত্র চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের একখানা 'তরুণ' নামক মাসিক পত্র এবং একখানা 'নবীন জগৎ' নামক সাপ্তাহিক ছিল। এই সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়

মন্তব্য সম্বন্ধে দুজনে একটু মতের অনৈক্য ঘটিতেছে। ম্যানেজার সেদিন এমন একটুখানি আভাস দিলেন তার ভাবটা যেন নরেশ তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক ভাব সর্ব্বদা বজায় রাখিতে চাহিলে উঁহার এখানে চাকরী করা একটু অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, এই রকমেরই। নরেশ এই বিষয়েই কিছু ভাবিতেছিলেন।

পরিমল আসিয়া প্রবেশ করিল।

"নিরঞ্জনের কাছ থেকে এই এক্ষুণি পড়া শেষ করে এলেম। ওর কাছেই আমি পড়বো, তুমি রাগ করো না।"

নরেশ একটা অপ্রিয় আলোচনার পরেই অপ্রিয় চিন্তার (এবং শুধু এই একটীই নয় আরও অনেকগুলারই) হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় হয়ত মনের মধ্যে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্যানুভবই করিলেন। চোখ না ফিরাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কই না, রাগ তো করিনি।"

পরিমল তাঁহার গা ঘেঁসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল "তা বই কি, রাগ নাকি আমার তুমি করতে বাকি রেখেছিলে! কদিন ধরে দেখাই পাইনে, কথাই কও না, আবার বলা হচ্চে, 'রাগ করেননি!' মাগো! এম্নি করেই কি তা বলে শাস্তি দিতে হয়? ওর চাইতে যে কান মলে দেওয়াও ঢের ভাল ছিল।"

নরেশ নিজের মনের চিন্তা তন্ময়তায় যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যে এতটাই ত্রুটী ঘটিতে দিয়া ফেলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া মনে মনে লজ্জিত ও ঈষৎ দুঃখিত হইয়া পড়িয়া তাহার হাত দুটি নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিবারভাবে কহিলেন, "তাই নাকি? এসো তাহলে কান মলে দিই।" এই বলিয়া তাহার লজ্জায় রাঙ্গা কর্ণমূল দুই আঙ্গুলে ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

পরিমল ওইটুকু আদরেই একেবারে গলিয়া পড়িল। তারপর অনেক-

খানি দানের একটু একটু প্রতিদান কাড়িয়া ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল "বল রাগ ভাল হয়েছে বল ? রাগ করোনি বল্লে তো আমি মান্‌বো না, আমি জানি যে তুমি আমার উপর খুব বেশী রকম রাগ করেছিলে। এত শীগ্‌গির যে আমায় আদর করবে সে আমি একবারে ভাব্‌তেই পারিনি !"

নরেশ তখন আদরের গৌরবে গরবিনীকে আর একটু 'উপরি' পাওনা পাওয়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আহা, এমন জান্‌লে না হয় একটু রাগ করেই থাকতুম যে ! তা আমার রাগটা কেন হয়েছিল বলো তো ? আচ্ছা দাঁড়াও মনে করি। নাঃ পারলুম না। তুমিই মনে করে দাও দেখি। কিন্তু দেখ, যেন মিথ্যে করে যা' তা' একটা বলে দিও না।"

পরিমলও এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইয়া শেষে বলিল, "উনি রাগ করে জব্দ করবেন আমায়, আবার উল্টে তার হিসেব নিকেশ করতে হবে আমাকেই। এ মজা তো বড় মন্দ নয় দেখি ! ঈস্, আমি বল্‌বো কেন ?"

নরেশ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, "বেশ মশাই, বেশ ! না হয় বল্‌বেন না। না হয় এবার থেকে আমার রাগের হিসাব রাখবার জন্যে আর একটা হিসাবনবিশই রেখে দেবো, তার জন্য আর হয়েছে কি।"

পরিমল আর এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিলে পর স্মরণ করাইয়া দিল যে, সেদিন সে নিরঞ্জনের কাছে আর পড়িবে না বলিয়াছিল, এবং তারপর হইতেই নরেশের মুখ বেজায় ভার ভার দেখা যাইতেছে।

নরেশ তখন যেন চমক ভাঙ্গা হইয়াই বলিয়া উঠিলেন "ওহো তাও তো বটে ! তাহলে এখন তাকে নিয়ে কি করা যায় বলো দেখি ? তা ওকে তুমি যদি বরখাস্তই করলে তাহলে না হয় ওকেই আমার রাগ

কর্ত্তার হিসাব রাখবার জন্য রাখাই যাক্ না কেন? একটা কাজ তো ওকে দিতে হবে।"

হাস্তের কল ঝঙ্কারে চারিদিকে মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিমল বেদম হাসি হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ তাই দাও। আমি হরির লুট মেনেচি, তুমি ওকে যাতে নিজের কাজে লাগাও তারই জন্যে। তা হলেই তোমার হিসাবের কড়ি আর বাঘেও খেতে পারবে না।"

নরেশচন্দ্রও প্রথমটা তাহার হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর একটু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন "সত্যি কি নিরঞ্জন বড্ড বেশী অন্যমনস্ক?"

"তুমি দিন কতক পরীক্ষা করেই দেখ। আমার মাথা খাও।"

নরেশ কহিলেন "তাই দেখবো, প্রেসের ম্যানেজার বোধ হয় চল্লো। যে কদিন নতুন না পাই ওকেই সঙ্গে নিয়ে চালাবো।"

পরিমল পরম পরিতোষ লাভ করিল, সম্বন্ধটা অন্য রকম না হইলে হয়ত বলা যাইত প্রাতর্বাক্যে তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্য আশীর্ব্বাদ করিল, এক্ষেত্রে তা অবশ্য করিল না; কিন্তু বিশেষ রকম যত্ন করিয়া সে স্বামীর কপালের ঘাম নিজের শান্তিপুরে সাড়ীর আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল। 'কত ঘামচো?' বলিয়া ঘরে ইলেকট্রিক পাখা খোলা থাকা সত্ত্বেও নিজের আঁচল ঘুরাইয়া তাঁহাকে হাওয়া দিতে লাগিল এবং আরও পতি সেবার কি কি খুঁটিনাটি সমাধা করিতে মনোনিবেশ করিয়া দিল, তার খবরে কাজই বা কি?

কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, নিরঞ্জনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা তার যতই থাক না কেন, বুঝি আনন্দও একটুখানি কোথায় যেন ছিল। সেই আপ্‌নাভোলা অসহায় ও নিঃসঙ্গ জীবটীকে সে যে ঘণ্টাখানেকেও একটুখানি কাজ

দিয়া রাখে; এইটুকু হইতেও সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসরের ক্লান্ত জীবনটাকে বঞ্চিত করা তার কাছে হঠাৎ যেন চৌর্য্যের মতই অপরাধ-জনক ঠেকিল। আর এই অবসরে এই বিপুল রাজপ্রাসাদের অসংখ্য দাসদাসীবর্গের দ্বারায় উৎপীড়িত উপদ্রুত মানুষটাকে সে যে কতকটা রক্ষা করিয়াও চলিতেছিল, সেইটুকুকে হারাইয়া ফেলায় তার মন আজ পীড়া বোধ করিতে লাগিল। আহা, ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে কি নিপীড়িত—কি ভীষণরূপেই নিপীড়িত সে; আর কি তাকে পীড়ন করিতে দিতে আছে? নিজের স্বামীর মহত্ব অনুভব করিয়া সেদিন এম্‌নি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, রাত্রে নরেশ শয়ন করিতে গেলে, সেও তৎক্ষণাৎ আর এক দিক দিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। নরেশের মন যদিও সে সময় পত্নী সম্ভাষণের ঠিক অনুকূল ছিল না,—বড়ই চিন্তাম্লান ও ভরাক্রান্ত—তথাপি স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "এসো।"

স্ত্রীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটুখানি ত্রুটি বোধ থাকার কুণ্ঠাতেই তাহার পরে, সময় সময় আদরের মাত্রাটা কিছু বেশী করিয়াই বর্দ্ধিত করিতে হয়, সেখানে নিজের শরীর মনের আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া বুঝি একেবারেই চলে না!

পরিমল আসিয়া টিপ করিয়া তাঁহার পায়ে একটা প্রণাম করিল, আর একদিনকার একটা অবিস্মৃত এম্‌নি দৃশ্যই স্মরণ করিয়া নরেশের হৃদ্‌পিণ্ড অমনি প্রমত্তবেগে ফুলিয়া উঠিল, তিনি কষ্টে সংযত হইয়া উহা চাপা দিবার জন্য উহাকে নিজের বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ধরিলেন।

"ঈস্‌!—আজ হঠাৎ এত ভক্তি কেন?"

"অভক্তিই বা কবে ছিল? ভক্তিভাজনকে ভক্তি করবো না?" বলিয়া পরিমল স্বামীর আদরটুকু নিঃশেষে উপভোগ করিয়া লইল। নরেশ তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"আমি বলবো, কেন প্রণাম পেলুম?"

পরিমল বলিল "বল তো দেখি কেমন বল্‌তে পার?"

"আদর খাবার জন্যে।"

"যাও, হ্যাঃ,—তা বই কি? আমি এক্ষুনি চলে যাব।" পরিমল এই অনুযোগ জানাইলেও নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়িয়া যাইবার কোন ত্বরা দেখাইল না।

"তা'হলে নিরঞ্জনের চেলাগিরি ছাড়িয়ে দিয়েছি বলে? ঠিক কি না?"

"না, তাও না।—ভাল কথা! নিরঞ্জন তোমার কাজ করচে কেমন বল তো?"

"চমৎকার! নিরঞ্জন যে এতটাই বিদ্বান তা আমি কখন মনেও করতে পারিনি। ইংরাজীতে, বাংলায়, হিসাবে পত্রে, সকল দিক থেকেই ওর সমান শক্তি। বি, এ, এম, এ, পাশ না করলে কখনই অমন হ'তে পারে না,—অন্ততঃ অতদূর পড়াও চাই। কে জানে ওর কি রহস্য! একি কোন দিনই জান্‌তে পারা যাবে না?"

কথাগুলো নরেশচন্দ্র পরিমলের চেয়ে বোধ করি নিজের মনকেই শুনাইতে চাহিয়া বলিলেন।—

"যতই ওকে দেখ্‌ছি ততই যেন নূতন নূতন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্চি! ও যেন একটা জীবনযুক্ত সারনাথ বা সাঁঞ্চির ভগ্নস্তূপ! বাহিরেরটা সব মাটির ঢিপি হয়ে গেছে। কিন্তু যতই খুঁড়ে তোল, অভিনব অভিনব ভাস্কর্য্যের আবিষ্কারে মন যেন বিস্ময় সাগরে কূলহারা

হয়ে যায়! ও'কে? কে জানে ওর পরিণাম কেমন করেই অমন হলো!"

সহসা বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতই কোন্ কথা স্মরণে আসিয়া পরিমল স্বামীর বক্ষে চঞ্চল হইয়া মুখ তুলিল, "দেখ ওর একখানা ডায়ারি আছে। আমি দেখছি ও বসে বসে তাতে কি সব লিখে রাখে। সেইখানা পেলে হয়ত ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যেতে পারে।"

অবিশ্বাসের মৃদু হাস্যে নরেশচন্দ্রের অধর কুঞ্চিত হইল। "তুমি যেমন পাগল!—পাগলের আবার ডায়ারী! আর থাকলেই বা ও আমাদের সে দেখাবে কেন? তাই যদি দেখাবে, তাহলে তো সব বলতেই পারতো।"

পরিমলের মনের মধ্যে যাই থাক, তাহা প্রকাশ না করিয়া মুখে সেও স্বামীর কথায় সায় দিল, সংক্ষেপে বলিল, "তা বটে।" কিন্তু সেটা ঠিক তার মনের কথা নয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মনের আবেগে উড়িতে চায়, অক্ষম পাখা পড়িয়া যায়,
বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

—তীর্থরেণু

নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যথিত করিতেছিল সুষমার এই চিঠিখানা।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন

পূজ্যতমেষু !

সেদিন ডাকাইয়া আনিয়া সবকথা আপনাকে আমার বলা ঘটে নাই এবং সাম্‌নে বলার ভরসা না রাখিয়াই তাই আজ পত্রে সে কথা জানাইতে বসিয়াছি। এই সাহস ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জন্য শ্রীচরণে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শিশুপালের শত অপরাধের চেয়ে বেশী স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিতে পারেন নাই; আর আপনি তো আমার সহস্র অপরাধকেও সহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাই ভরসা আরও না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।.........

সেদিনও আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আমার বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পদ্ধতি আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতেছে। পাখীকে খাঁচায় পুরিয়া মানুষে তার স্বাধীন জীবনের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বিলাসে আদরেই তাহাকে ভরাইয়া দিয়াও যেমন তার স্বাধীনতার স্মৃতিকে ভুলাইয়া দিতে পারে না, মানুষের মনকেও তেমনি তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য শান্তির ও অজস্র সুখের নীড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও বুঝি তাহার উদ্দাম উন্মুক্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও রোধ করিতে পারা দায় হয়। তার মন যখন কর্ম্মের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন বিশ্রাম শয্যা তার

পক্ষে কণ্টকারণ্যের স্থানাধিকার করে। তার পরেও যদি জোর করিয়া তাহাকে সেখানে পড়িয়া থাকিতে হয়, তো সে কাঁটা শুধু তার শরীরকে নয়, তার মনকে শুদ্ধ তীক্ষ্ণ ধারে বিঁধিয়া বিঁধিয়া রুধিরাক্ত ও অসাড় করিয়া দেয় (তাই অধীন জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের দিনে দিনে দুর্ব্বলদেহ ও ক্ষীণ প্রাণ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়া অনিবার্য্য)।—আমারও সেই অবস্থা। শুধু নিজেকে লইয়া দিন কাটা নয়, নিজের কাছে নিজের দাম এতটাই কম হইয়া গিয়াছে যে সে কি বলিব,—এটা যদি আমার কোন তৈজস পত্রের সামিল হইত তো এটাকে জঞ্জালের সঙ্গে ঝাঁটাইয়া আমি কোন কালে আদি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিতাম।

আমায় কাজ দিন,—কোন—কোনও একটা কাজ দিন। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরী আমি পাই না কি? বেশী না জানি 'ক খ' ও তো ছোট মেয়েদের শিখাইতে পারিব। কোন ভদ্র পরিবারে গান শিখাইবার অধিকার কি আমার আছে? যেখানে আমি আদরের সহিত অভ্যর্থিতা হইব, সেই আমার স্বজাতি-বর্গের মধ্যে পা দিবার কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ভয়ে কাঁপে। অথচ আমি জানি সেইখানেই আমার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। যদি তাদের মধ্যের একটা জীবনও আমার দ্বারা রক্ষিত হয়! জানি আমার মত পুণ্য সঞ্চয়হীনার পক্ষে সে পুণ্যের প্রলোভন নেহাৎ সামান্য নয়। কিন্তু আমার তাহাতে ভরসা হয় না। মনের মধ্যে আমার প্রৌঢ়ত্ব দেখা দিলেও বয়সে আমি আজও ত কুড়ির সীমা ছাড়াইতে পারি নাই। নিজের উপরে বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইলেও পরের উপর এখনও যে ভয় রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন যাহাদের আমি পাপ পথ হইতে ফিরাইয়া আনিব, তাদের আশ্রয় কোথায়? সেও যে

একটা মস্ত বড় অভাব রহিয়াছে। সবার মনেই কিছু এত বড় বৈরাগ্য জাগিবে না যে, কাশীবাসিনী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া লইতে পারিবে।

তা'হলে আমার পথ কি? আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি নিজেই একবার সে পথটা খুঁজিয়া দেখি? প্রথমে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখি যদি ভদ্র পরিবারে কর্ম্ম পাই, অন্যত্র চেষ্টা আমি করিব না। আমার মত অপবিত্রার পক্ষে নিতান্ত স্পর্দ্ধা হইলেও চিরদিনই আমার বড় লোভ হয় যে উঁহাদের পবিত্র সঙ্গে নিজের এই শূন্য নিরালম্ব জীবনটাকে আমার একটুখানিও আমি পবিত্র করিয়া লই। মিশনরী মেমরা ও তাদের আয়ারা যেটুকু পায়, জানি না সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আমার মত হীনজনের আছে কি না?—কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? বলুন, অনুমতি দিন, আদেশ করুন,—ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি? শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।

আপনার সেবিকাধমা
সুষমা দাসী।

নরেশের মনের মধ্যে এই মিনতি ও বেদনাভরা আবেদন খানির প্রতি পংক্তিটী যেন বিছার কামড় মারিতেছিল। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তার প্রতি একবার অভিমান হইল, অমন একটি জীবনকে কেন তিনি এমন ব্যর্থ করিবার জন্য অস্থানে পাঠাইলেন!—নিজের অক্ষমতার পরেও রাগ ধরিল; সে যদি উহার রক্ষাভারই গ্রহণ করিয়াছিল, তবে তাহার যশ অকলঙ্কিত রাখিতে পারিল না কেন? লোক চক্ষে তাহার মর্য্যাদাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া তাহার একেবারেই উচিত হয় নাই এবং পরিশেষে সেই অসহায়া বালিকাকে তাহার বন্দীগৃহে একাকিনী দুর্ব্বহ জীবন বহনে বাধ্য করিয়া নিজে

সে শত উদ্দীপনা ও আনন্দের জীবনে এই যে সরিয়া রহিল, এর মধ্যেও যে কত বড় কাপুরুষতা বিদ্যমান রহিয়াছে তা' ভাবিয়াও লজ্জায় মাথা তাহার হেঁট হইয়া আসিল। আরব্ধ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে যাহার সাধ্যে কুলাইবে না, সে তেমন কাজের ভার মাথা পাতিয়া লয় কেন?

বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কয়দিন পরে এই পত্র লিখিয়া দ্বারবানের হাতে পাঠাইয়া দিল।

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন

সুষমা!

তোমার পত্রে তোমার আগ্রহ ও উদ্যমের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে তোমায় আর নিবৃত্ত করিতে পারি না। তুমি বুদ্ধিমতী; নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে তোমার বিচার আমার চেয়ে তুমি নিজে ভালই করিতে পারিবে। তোমার অন্তরের পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা আমার অবিদিত নয়; তোমায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করি। যাহা সঙ্গত এবং সম্ভব বোধ করিবে তাহাই করিও। যখন যে সাহায্যের আবশ্যক, অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইতে দ্বিধা করিও না। ঈশ্বর তোমায় কুশলে রাখুন এবং মঙ্গল করুন এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার চিরশুভার্থী

নরেশচন্দ্র।

সুষমা এই পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে একবার এবং পরে আর একবার দেবনির্ম্মাল্যের ন্যায় সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় উহা নিজের মাথায় ঠেকাইল। পাঠশেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি চিঠিখানি নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তারপর গভীর চিন্তামগ্না হইয়া সে একেবারে তাহারই মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিল। যে অনুমতি পাইবার জন্য কয়দিন দিবারাত্রে সে বারিপ্রত্যাশী ঊর্দ্ধমুখী

চাতকের ন্যায় আশাপথপানে চাহিয়াছিল, সে প্রত্যাশা তো পূর্ণ হইল। কিন্তু কল্পনা—সুন্দর ও মধুর কল্পনা বাস্তবের বেশে যখন দেখা দিবে, তখন তার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য যদি ঠিক সেই মানসীরূপে দেখা না দেয়, যদি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দেখা দেয়, তবে সে যে সহিতে পারা দায় হইবে! এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপরে হঠাৎ সুষমার স্মরণ হইল যে, তার প্রাণে সবই সহিয়া যায়। তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া সে নরেশচন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদান করিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন

পূজ্যতমেষু!

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া কৃত-কৃতার্থা হইলাম। এইবার চিরদিনের স্বপ্ন সফল করিতে সচেষ্ট হইব। কেমন করিয়া কাজ আরম্ভ করিব, কিছুই জানি না। আপনার অবশ্য অনেক বড় ঘর জানা আছে কিন্তু সে সব জায়গায় হয়ত আমার প্রবেশ নিষেধ। কারণ পরিচয় পত্রতো দিবার কিছুই নাই এবং দিলেও সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলেরই আশঙ্কা অধিক। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে পারেন কি? যদি সম্ভব ও সঙ্গত হয় করিবেন।

আপনার সেবিকাধমা

সুষমা দাসী।

এই পত্র পাইয়া নরেশচন্দ্র আরও একটু বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে এই প্রথম চেষ্টায় সুষমা অকৃতকার্য্য হইবে। তাহার হতাশাকাতর মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করিয়া লইয়া তিনি তাহার জন্য অত্যন্ত উষ্ণ ও দীর্ঘ একটা নিশ্বাস মোচন করিলেন। তার সেই যে মুখ আধ অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত, মানসিক

সংগ্রামে বিধ্বস্ত অথচ সুদৃঢ় চিত্ত বলে বলীয়ান সেই যে দুটী চোখের দৃষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘকালের লেখাকেও পরাভব করিয়া দিয়া তাঁহার মানসনেত্রে যখন তখন ফুটিয়া থাকে, তাঁহাকে জাগ্রতে বা নিদ্রিতে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়, আর একবার তাহাদের মধ্যে তীব্র হতাশার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার শিখা তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। সেদিনের ত্যাগে আত্মপ্রসাদ সব কিছু ক্ষতিকেই জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এযে শুধুই আঘাত ও অপমান। অথচ জীবনের এই লক্ষ্য ধরিয়াই যে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে,—শুধু স্বেচ্ছায় নয়—ইহারই জন্য যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে,—আর তাই করিতে গিয়াই যে আরও বিশেষ করিয়াই লোক-লোচনের ও জনরসনার তীক্ষ্ণ ও নির্দ্দয় সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে পথ হইতে অপরীক্ষিত ভাবেই বা তাহাকে ফিরিতে বলা যায় কেমন করিয়া?—বিশেষ সকল দিকের পথই যাহার সঙ্কীর্ণ।—কিন্তু কেমন করিয়াই বা উহার আকাঙ্খা পূর্ণ করা যায়? যখন মুমূর্ষা সুগন্ধা নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার আশার কথা জানাইয়াছিল, ভবিষ্যতে সুষমা একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক গৃহস্থ কন্যাদের শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করে এই সাধ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন সেটাকে নরেশচন্দ্রও খুবই সঙ্গত ও সহজ বলিয়াই বোধ করিয়াছিল, এবং সেই পথেই তিনি উহাকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছেন। তখন ভুলিয়াও তাঁহার মনে এ সংশয় জাগ্রত হয় নাই যে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে নিষ্কলঙ্ক সুষমাকে জনসমাজে কলঙ্কিতা হইতে হইবে এবং তাহার পক্ষে তখন শিক্ষয়িত্রীর আসন পাওয়া অধিকতরই কঠিন হইয়া পড়াও সম্ভব। সে ভুল ভাঙ্গিল বহুবিলম্বিত হইয়া।—যাহোক, এখনকার যেটুকু সদুপায় নরেশচন্দ্র তাহাতে আলস্য করিলেন না। সুষমার পত্রের উত্তর না দিয়া তিনি নিজেই প্রথমে এক-বালিকা

বিদ্যালয়ে'র উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। সেখানের মহিলা-অধ্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে নরেশের মন যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু দ্বিধার অবসর নাই। তিনি দু'একটা বাদ দিয়া প্রায় সব কথাই উঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। মহিলাটী বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিয়া লইয়া গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, "মাপ করবেন মশাই! আমাদের স্কুলে বিশেষ ভদ্র-সংসারের গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের ভিন্ন কাজ দেওয়া হয় না।"

নরেশ অন্তরে অন্তরে লজ্জানুভব করিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, "যদি সেই মেয়েটী বিনা বেতনে এখানে দু'এক দিন মেয়েদের গান ও বাজনা শিখিয়ে যায়, তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

প্রবীণা মহিলা অবিচলিতস্বরে জবাব দিলেন, "সেরকম আমাদের নিয়ম নয়। চরিত্র সম্বন্ধে উঁচু রকম সার্টিফিকেট্ অন্ততঃ দু'তিন জন বিজ্ঞ ও বিশেষরূপ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হ'তে না আন্‌লে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কাকেও মিশ্‌তে দেবার নিয়ম নাই।"

সুষমার জীবন চরিতের সঙ্গে এই আপত্তিটার অকাট্য ও সুদৃঢ় সংযোগ দেখিয়া নরেশচন্দ্র সেখান হইতে নিরুত্তরে প্রস্থান করিলেন।

আরও দু'এক স্থলে প্রায় একইরূপ উত্তর লইয়া তিনি ওদিকের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ছোট খাট অর্দ্ধঅচল প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বিনা বেতনের সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে অবশ্য অতটা তাচ্ছিল্য ঘটা হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড়দের কাছে হতাশ হইয়া নরেশের আর ছোট দরবারে হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ তাঁহার মনে হইল, যদি উচিতের দিক ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এসম্বন্ধে বাধ্য করা বা লোভে ফেলা অনুচিতই হইবে। কারণ সুষমা-জাতীয় জীবদের বিশ্বাস করিয়া

কতকগুলি অপরিণতমতি বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া কতদূর সমীচীন তাহা ভগবানই জানেন। সুষমা যদি তাঁহার এমন পরিচিত-তমা না হইত, তবে নিজেই তো তিনি ইহার বিরোধী হইয়া উঠিতেন। বড়ই সমস্যার বিষয়!—এদের পথ দিতে হইবে, কিন্তু সে পথ দিতে গিয়া আবার অন্যের পক্ষে এতটুকু না তাহা পিচ্ছিল হইয়া পড়ে, তার উপরও যে দৃঢ়বদ্ধ দৃষ্টি রাখার একান্তই আবশ্যক।

নরেশের এক উদারমতাবলম্বী বন্ধু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'বিশ্ব প্রেমিক' নাম দিয়াছিল; আসল নাম তাঁর, বিশ্বপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। নরেশের মোটর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড় ফিরিতেছিল, বিশ্বপ্রিয় চীৎকার শব্দে ডাকিল, "রাজাবাহাদুর!"

নরেশ মনে মনে যেন ইহাকেই খুঁজিতেছিলেন, উল্লাসে ব্যগ্র হইয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলে গাড়ীখানা যতটা অগ্রসর হইয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণে বিশ্বপ্রিয় নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলে-ছেন?" নরেশ গাড়ীর দরজা নিজে খুলিয়া ধরিয়া উহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনার কাছেই। আস্‌বেন একটু?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

না হয় দেবতা আমাতে নাই।—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা সাধকেরা পূজা করেত তাই ?
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে চিরদিন তার বিসর্জ্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে আর কি পূজিবে পৌরজন ?

—কাহিনী

বিশ্বপ্রিয়কে নরেশ সুষমা সম্বন্ধীয় সমস্যার কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বপ্রিয় সব কথাই নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিল কিন্তু সুষমার সঙ্গে নরেশের যে কখন কোন অসৎ সম্বন্ধ ছিল না, এই কথাটা সেও মনে মনে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না! রাজা নরেশের যে প্রবল প্রতাপান্বিতা 'উপসর্গ'টীর জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীর অনেকখানি আত্মীয়-রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ যথার্থ বড়লোকের ছেলের দলে স্থান লাভ করিবার নেহাৎই অযোগ্য নহেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং অন্যসকলের মত বন্ধুসমাজে তাঁর 'নিজ জনের' পরিচয় করাইয়া দিতে উহাকে পাশে লইয়া, কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী আর কি পার্শী থিয়েটারের রিজার্ভ বক্সে বসিয়া অভিনয় না দেখায়, বাগানের মজলিসে তাহার 'মুজুরা' না করানোয় ধনী মহলে যে নিন্দার সীমা ছিল না, এসব তো আর লুকানো কথা নয়। আজ হঠাৎ একেবারে জলজ্যান্ত সেই জীবটীকে বেমালুম উড়াইয়া দিতে চাহিলে সে উড়িবে কেন? বন্ধুদের মধ্যে নরেশের আড়ালে অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে—অবশ্য যাঁদের একটু কাব্য-রসোপভোগ সামর্থ্য ছিল—উল্লেখ করিতে হইলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে 'বসন্ত সেনার চারু দত্ত' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বিশ্বপ্রিয় নিজেও কখন কখন যে না করিয়াছে তা নয়। অতএব সে স্থির করিল,

বিবাহিত ও নূতনের আস্বাদপ্রাপ্ত নরেশ সুষমাকে পুরাতন ও জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিতেই ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রবল অনুকম্পা পরবশ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল—"কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি তার জন্য ভাল দেখে কাজ ঠিক করে দেবো। গান শেখাবার কাজের আবার ভাবনা! লোকে একটা শেখাবার লোক পায় না।"

নরেশ বিশ্বপ্রিয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চিনিত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী গেল এবং সুষমাকে লিখিল, স্কুলে সুবিধা নয়, তবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে কাজের জোগাড় শীঘ্র হইবারই সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাইলেই জানাইব।

শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল এবং বিশেষভাবে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও অগত্যা এক রকমে মনস্তুষ্টি করিয়া লইয়া নরেশ সুষমাকেও সেই খবর তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। সে চিঠি পাঠাইতে তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত ও পতিত হইল।

কিন্তু সুষমার ইহাতে যেন আনন্দের আর অবধি রহিল না। কাঙ্গালে যেন কি নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে, এমন করিয়াই সে নেহাৎ সাত বছরের মেয়ের মতন আহ্লাদে প্রায় নাচিয়াই উঠিয়াছিল। এক বিলাতফেরৎ পরিবারে তাহাকে দু' তিন ঘণ্টার জন্য দু' এক রকম বাজনা শিক্ষা দিতে হইবে। বাড়ীতে কেবল স্বামী স্ত্রী। স্ত্রীটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন ধনাঢ্য ও নব্য তন্ত্রের ছেত্রী কন্যা, স্বামীটী বাঙ্গালী।

সুষমা উঠি পড়ি করিয়া রান্না খাওয়া সারিল, বরাবর সে নিজেই রাঁধিয়া খায়। নরেশ প্রথমাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিলাসিনীর গর্ভপ্রসূতা সুষমা বিলাস সুখকে তুচ্ছ বোধ করিতে শেখে সেই শিক্ষাই তিনি তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সুষমারও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তিবোধ ছিল না।

আহার সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি সে বেশভূষা সমাপ্ত করিয়া লইল। সুষমা বড় একটা লোকসমাজে বাহির হয় নাই। ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া জীবনের মধ্যে এই তার প্রথম। কাপড়ের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহার ভাবনা হইল কি পরিয়া সে আজ বাহির হইবে? যতদিন সুষমা ছোট ছিল চাঁদনির বাজারে কেনা ফরিদপুরী ছিটের ফ্রক ই একমাত্র তাহার জন্য কিনিয়া দেওয়া হইত। বৎসরে একবার পূজার সময়ে একটা সিল্কের পোষাকের মুখ সে দেখিতে পাইয়াছে। তের বৎসর বয়স হইলে প্রথম সে সাড়ী পরার জন্য আবেদন জানায়, তারপর হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর সবচেয়ে মোটা ও কম দামী সাড়ী, টাটা মিলের মার্কিণের সেমিজের সঙ্গে সে আটপৌরে পরিবার জন্য পাইয়া আসিয়াছে। পূজায় একখানা ঢাকাই, শান্তিপুরে নেহাৎ অল্প দামের বাজে বেনারসী এই রকমই কিছু পাইত। সেখানি সে দু'একদিন পরিয়া সযত্নে ভাঁজ করিয়া গুছাইয়া তাহাতে দু'একটী কর্পূরের চাক্তি আনাইয়া দিয়া রাখিয়াছিল। এই শেষ তিন বৎসর নরেশ তাহাকে পূজার কাপড় কিনিয়া দেন নাই, খরচেয় টাকা এই তিন বৎসর তার নামে মনিঅর্ডারে আসে। রাজবাড়ীর সরকার বা দরওয়ানেরা আর তাহার মাসকাবারী বাজার করিয়া দিয়া যায় না। কাপড় সে পূর্ব্বের মতই কেনে, পূজার সময় নিজের চাকরদের কাপড় কিনিয়া দেয়, নিজের জন্য কেনে না। মনে মনে এই কথা বলিয়া মন তাহার বিমুখ হইয়া থাকে যে, ওরা আমার চাকর তাই ওদের আমি দিচ্চি, আমি যাঁর দাসী তিনি যখন আমায় দিলেন না, তখন আমার কাজ কি?

তাই আজ বহুকাল পরে ধূলাপড়া ট্রাঙ্কের ডালা তুলিয়া সে চুপ করিয়া তার অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারটীর পানে অনেকক্ষণই চাহিয়া থাকিল। এক একটী সাড়ী জ্যাকেটের ভাঁজে ভাঁজে যেন তার এক

একটি অতীত বৎসরের স্মৃতির স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সে ঠেলিয়া উহাদের যেন নাড়া দিতেও তার বুকে বাজিতেছিল। তারপর অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া এক একটি করিয়া সে সেগুলিকে মাটিতে নামাইতে লাগিল। এই গোলাপী ডুরে সাড়ীখানি সর্ব্বের প্রথম বৎসর তিনি নিজে হাতে করিয়া দিয়াছিলেন! সুষমা কাঙ্গালের মতন সেখানিকে গায়ে বুকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বারম্বার উহাতে চুম্বন করিল। যেন ইহাতে আজও সেই দাতার হাতের সৌরভটুকু পর্য্যন্ত লাগিয়া আছে,—এমনি আগ্রহে উহার ঘ্রাণ লইল। সে কাপড় পরা চলিবে না;—উহা আবার সযত্নে সাবধানে যথাস্থানে রক্ষিত হইল। আর একখানি সাড়ী তার সঙ্গের জ্যাকেটটীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুষমার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। কালীঘাটের মহিলা সভার সেই জ্যাকেট সাড়ী! গভীর ঘৃণায় হুঙ্কারজনক জঘন্য বস্তুর ন্যায় সে তাল পাকাইয়া সে দুটাকে বাক্সের মধ্যে দু' আঙ্গুলে ধরিয়া ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে দিনের দুষ্টা স্মৃতি তার দেহ যে দিন ভস্মাবশেষ হইয়া যাইবে, সেই ছাইএর মধ্য হইতেও বুঝি মিলাইবে না। নিজের জন্য যত না হোক, সে যে তার আশ্রয়দাতার কত বড় গ্লানির মূল, সে দিন বড় আঘাতেই সে পরিচয় যে সে পাইয়াছে! তার আগে, স্বপ্নেও যে তেমন সম্ভাবনা তার মনের কোণেও কখন জাগে নাই! জাগিলে—কি করিত?—বলা যায় না। তার দেবতার চিত্তে তার জন্য ব্যথা বোধ যে বিশেষভাবেই আছে, অন্ততঃ এটুকু জানিবার পূর্ব্বে এত বড় লজ্জাকর দুঃসংবাদটা তার কর্ণগোচর হইতে পারিলে নিঃসন্দেহ সে নিজেকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিত না। কিন্তু এখন? আত্মহত্যার অধোগতি তার এই অধোগতিতে প্রাপ্ত জীবনের শেষ সঞ্চয় করিয়া লইতে যত না মায়া হয়, তার চেয়ে বেশী মনে লাগে,

তার শোচনীয় মৃত্যু নিশ্চয়ই নরেশকে যে বেদনা দিবে তাই ভাবিয়া।

একখানি ভোমরাপেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী ও একটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরিয়া নিজের গলায় পরা একমাত্র সম্পত্তি এক নল সরু গোট হারটুকু জামার উপর তুলিয়া দিতে হঠাৎ কি মনে হইল। ছোট আরসিখানি পাড়িয়া সে নিজের মুখ দেখিল। তারপর আবার কি ভাবিয়া সেই জ্যাকেট সাড়ী ও হারটুকু খুলিয়া ফেলিয়া আটপৌরে মোটা সাড়ীর সঙ্গে একটি পাবনা ছিটের চেককাটা রংজলা হাতাবড় জ্যাকেট পরিয়া সাজসজ্জা সমাধা করিল। হাতে রহিল দুই গাছি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও হাতের সঙ্গে আঁটিয়া বসা সোনার চুড়ি। এক সময় উহাদের বরফির মতন কাটুনি ছিল, কিন্তু এখন সে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ও দু' এক গাছার মুখ ছুটিয়া গিয়াছে।

নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পাইয়া সুষমার আনন্দের আর অবধি রহিল না। এত দিনে যেন জন্ম সফল হইল বলিয়া তার মনে হইল। মায়ের শেষ ও প্রধান ইচ্ছা যে অংশতঃ পূর্ণ হইতে পারিয়াছে ইহা মনে করিয়াও তাহার মনে সুখ ধরিতেছিল না। মা যে নিজের পথ হইতে সযত্নে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আজিকার এক আনন্দময় জীবনের পথটুকু প্রস্তুত হইবার সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন এই মনে করিয়া সে তাহার উপর একটুখানি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। নতুবা মায়ের উপরের অভিলাষ যে তাহার কত বড় তাহা সে নিজেও যেন পরিমাপ করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিজেদের পাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধে অপর জীবনকে কলঙ্ক কালি মাখাইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষে কঠিন বন্ধুর ধূলিশয্যায় শোয়াইয়া দেয়, তাদের অপরাধের তুলনা আর কোন কিছুরই সঙ্গেই কি হইতে

পারে? মানুষ নিজেকে লইয়া তার যা খুশী করিতে হয় করুক; কিন্তু আর একটি জীবনকে সে নিজের পথে আনয়ন করিতে কোন মতেই অধিকার প্রাপ্ত নহে। সেই মার কাছেই বোধ করি জীবনে এই প্রথমবার সে মাথা নোয়াইল এই বলিয়া যে, যতই হোক যখন এই জাতীয় নারীর গর্ভেই পূর্ব্বজন্মের মহাপাপে তাহাকে স্থান লইতে হইয়াছিল, তখন ভাগ্যে তার মায়ের মনে ওই ধর্ম্মজ্ঞানের বীজটুকু রোপণ করিয়া ভগবান তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন, নহিলে আজ তার কি গতি হইত?

চাকরীর প্রথম ধাক্কা খাইল সে চাকরী করিতে মুনিববাড়ী সর্ব্ব প্রথম পা দিয়া। কর্ত্রী এবং তাহারই ছাত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি মিসেস গুহ;—তা জানেন বোধ হয়? আপনাকে আমি মিস বা মিসেস কি বলবো অনুগ্রহ করে আমায় আপনি বলে দেবেন। বিশ্বপ্রিয় বাবু সে কথা ওঁনাকে কিছুই তো বলেন নি?"

সুষমার ললাটে অচিন্তিত লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে নতমুখে উত্তর করিল, "আমার নাম সুষমা দাসী।"

"কিন্তু পদবীটা না জানলে আপনাকে আমি কি বলে উল্লেখ করবো তারই জন্য সেটা জানার—"

"না না, আমায় আপনি সুষমাই বলবেন, সেই আমার বেশী ভাল লাগবে।"

দ্বিতীয় দিনটা অমনি কাটিল, তৃতীয় দিবসে আর একটা সমস্যা দেখা দিল।

মিসেস গুহ মানুষটী বড়ই সাদাসিদে, ভাল মানুষ গোছের লোক মনের মধ্যে তাঁর ছল চাতুরী বড়ই কম। সে দিন সে আন্তরিকতার

সহিতই সুষমাকে জানাইল যে, তাহার গান বাজনা শুনিয়া তাহার স্বামী ও তাঁর একজন বড়লোক মক্কেল বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আগত সপ্তাহের প্রথমেই তাঁদের বাড়ীতে একটা বড় রকম 'পার্টি' হইবে তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা সুষমা সেদিন নিমন্ত্রিত সভায় গান ও বাজনা শোনায়।

সুষমা একথা শুনিয়া একটু পরে ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে উত্তর করিল "আমায় মাপ করবেন, আমি সে পারবো না!"

মিসেস্ গুহ একটু ভুল করিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "কেন পার্ব্বেন না? আপনাকে তো তেমন 'নার্ভাস্' বলে বোধ হয় না!"

সুষমা মৃদু হাসিয়া কহিল "তা নয়, আমি অপরিচিত পুরুষদের সামনে গাইবো না তাই বলছি।"

মিসেস গুহ একটু জিদ করিয়া বলিলেন "তাতে দোষ কি? গান গাওয়া কি কোন মন্দ কাজ? ওঁনার ভারি সাধ হয়েছে যে অতিথিদের আপনার এই চমৎকার গান শোনান।"

সুষমাকে সম্মত করিতে পারা গেল না।

দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিল। সুষমা নিজের মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বয়স্কা ছাত্রীর শিক্ষাকার্য্য অতি সত্বরে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইটুকু করিতে যে সুখ যে আত্মপ্রসাদ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতেছিল, বঙ্গ বিহারের শাসনভার হাতে পাইয়াও তাহা লাট সাহেবেরা পাইয়া থাকেন কিনা সন্দেহ। মাস কাবারে যখন চল্লিশ টাকার হিসাবে দশ দিনের মাহিনায় সে ১৩।/ হাতে পাইল, বুক যেন গৌরবে তাহার ফুলিয়া উঠিল। নিজের স্বাধীন এবং সৎপথের উপার্জ্জনে সে এখন হইতে নিজেকে পোষণ করিতে পারিবে।—প্রথম মাসের টাকায় মা কালীর কিছু পূজা পাঠাইয়া দিল এবং ভিখারীর জন্য কিছু রাখিল।

হাইকোর্ট বন্ধ ছিল; বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া বসিয়া চাখিয়া চাখিয়া কোন সুপেয় পদার্থ পান করিতে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ বাজনার শব্দ ভেদ করিয়া সুস্বর সঙ্গীত লহরী কাণের তারে ঝঙ্কার দিল। উৎকর্ণ হইয়াছিলেন দু'জনেই, কিন্তু অল্প পরে সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি! কে গাইচে বলতো? আশ্চর্য্য যে!"

মিঃ গুহ বলিলেন "গাইচে আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী সুষমা দাসী। আশ্চর্য্য বল্‌চো কেন? হ্যাঁ, তা বল্‌তেই পার।—হোয়াট্ অ্যান্ এক্স-কুইজিট রীচ্ ভয়েস্! কিন্তু—"

বন্ধু এসব কথাগুলো কাণে না তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ এমনই সুরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন যে মিঃ গুহর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

"কি হয়েছে? গলা ওর খুব ভাল নয়?"

বন্ধু সহাস্যে উত্তর দিলেন "কে বল্‌চে ভাল নয়? তা নয় মাই ফ্রেণ্ড! আমি তোমার জোর কপালের জন্য তোমায় 'কন্‌গ্রাচুলেট' করচি। 'রথ দেখা এবং কলা বেচা' একসঙ্গে তাহলে দুইই বেশ চালাচ্চো? আছ মন্দ নয়।"

"রেখে দে' তোর হেঁয়ালি! তুই কি চিনিস ওকে?"

সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তা আর চিনিনে, সুষমা দাসী যে আমার 'নেক্সট্‌ডোর নেবার'। ও গলা শুনেই যে তাই ধরে ফেলেছি। কি করে বাগালে দাদা?"

"আপনিই এসেছে। আচ্ছা ওর ব্যাপারখানা কি বলতো শুনি?"

"বল্‌চি! রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনেছ?"

"উঁ হুঁ, কই মনেত পড়ে না। তার?"

"হুঁ"

"তা'পরে?"

"চিরন্তনী। খুব ধুমধাম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাওনা বাজনা, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মোটর দাঁড় করিয়ে রাখা। তারপর আর কি, 'প্রস্থানং কুরু কেশব।' কিছুদিন একলা একলা স্বর সাধনা করে করে ইদানীং বোধ হয় পেটের নাড়ীতে কিছু টান ধরে থাক্‌বে, তাই শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে এই ষ্ট্রীটে এসে পৌঁছেছেন। তোমায় কিন্তু আমার ভারী হিংসে হচ্চে।"

মিঃ গুহ বিস্ময়সহকারে মন্তব্য করিলেন, "কিন্তু ধরণ ধারণতো সে রকম মনে হয় না। আমার সাম্‌নেই বার হতে চায় না।" বলিয়া গান শুনাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে রেখে দে ভাই ঢের দেখেছি। ওসব ওদের চাল। ওঁরাই ছুঁচ হয়ে ঢুকে' আবার 'ফাল হয়ে বার হন'। খুব দাঁও লেগেছেরে ভাই; খুব দাঁও! আমি তো এ পর্য্যন্ত কখন 'তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি।—কিন্তু সেই সঙ্গেই 'মন প্রাণ যা'ছিল তা দিয়ে ফেলেছি।"

কয়েকদিন পরে সুষমা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ী ও তার বিশ্বাসী দরওয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ড্রইং রুমে ঢুকিয়া দেখিল ঘর খালি, মিসেস গুহ সেখানে নাই। অন্যত্র ব্যাপৃত আছেন মনে করিয়া নিজের আসনের কাছে আসিয়া সে তাঁহাকে নিজের আগমন জানান্ দেওয়ার ইচ্ছায় যেমন এসরাজ তুলিয়া লইয়াছে, অমনি পাশের ঘরের পর্দ্দা নড়াইয়া মিসেস গুহর পরিবর্ত্তে বাহির হইয়া আসিলেন মিঃ গুহ।

সুষমা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল তাহার এ ঘরে অবস্থান না জানিয়াই গৃহস্বামী অকস্মাৎ এই ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে দেখিতে পাইয়া এখনই প্রস্থান করিবেন। কিন্তু নিরতিশয় বিস্মিতা হইয়া দেখিল,

তাহাকে দেখিতে পাইয়া গৃহত্যাগ করার পরিবর্ত্তে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তিনি তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সম্বোধন করিতেছেন।—

"গুডমর্ণিং ম্যাডাম! আমার গাফিলিতে আপনাকে অনর্থক এই কষ্ট পেতে হোল। মিসেস গুহ আজ বোনের বাড়ী গেছেন, ফিরতে তাঁর রাত হবে, তিনি বলেছিলেন আর্দ্দালিটিকে বলে রাখতে যে আপনি আসা মাত্রে এই খবরটা জানায়, আমার সেটা কিন্তু আদৌ মনে ছিল না, মাপ কর্ব্বেন।" মিঃ গুহ ক্ষমা প্রার্থনা শেষ করিয়া অঙ্গুলি-ধরা চুরোট ঠোঁটে চাপিয়া সেকহ্যাণ্ডের জন্য নিজের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সুষমা তাহা স্পর্শ করিল না। সে রাগে গুম্ হইয়া গিয়া কঠিন হইয়া রহিল; তার পর অন্যদিকে মুখ ও চোখ রাখিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে এই কথা শুধু বলিল, "চাকরদের একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল্‌বেন।"

মিঃ গুহ বড়ই বিপন্নভাবে জবাব দিলেন, "বেয়ারাটা আজ ছুটী নিয়ে গেছে, আর্দ্দালীটা এই মাত্র খেতে গেল, মালীটাও বাড়ী নেই, আপনি বসুন না, এক্ষুণি ওরা খেয়ে নিয়ে আসবে, ওরা এলেই গাড়ী আপনাকে আনিয়ে দেবো।"

অগত্যাই ভয়বিপন্না সুষমা স্পন্দিতবক্ষে ও শঙ্কিতমুখে দূরের একটা আসনে আলগোছ ভাবে বসিয়া পড়িল। স্পষ্ট করিয়া ইঁহার অবাধ্যতা করিতেও তাহার ভরসায় কুলাইল না।

মিঃ গুহ চুরোট টানিতে টানিতে সুষমার আপাদ মস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। মনে কিছু বিস্ময় ও দ্বিধা জাগিতেছিল। রাজারাজড়ার অনুগৃহীতার মত রূপ তাহার শরীরে থাকিলেও বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিপরীতই যে প্রমাণ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা ও

অ-সুখস্পর্শ পোষাকে তাহার সুডোল গঠনের সবটুকুই যেন চেষ্টা করিয়া ঢাকা। তাহার হঠাৎ মনে হইল বাকলবসনা শকুন্তলা যেন তাহারই সম্মুখে! আবার মুগ্ধ মন সুরেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করিল—'ওসব ওদের লীলা কলা, ঠাট ঠমক,—তা বুঝতে পারচো না!'

মিঃ গুহ তখন দ্বিধাশূন্যভাবে উহার সহিত আলাপ সুরু করিয়া দিলেন—

"একটা গান্ না, চমৎকার গলা আর হাত আপনার।" এই বলিয়া তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সত্যসত্যই সুগঠিত ও সুললিত হাত দু'টির পানে চাহিয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টি চোখে না দেখিয়াও অনুভব করা যায়। সুষমার ললাট হইতে বক্ষ অবধি সেই অনুভূত মুগ্ধ দৃষ্টির লজ্জায় রং মাখান হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া উহাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়া ফেলা হইবে বোধে সে অত্যন্ত বিনীত ও মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ থাক, একটা গাড়ী যদি আমায় দয়া করে আনিয়ে দেন।"—

মিঃ গুহ যথাপূর্ব্ব বসিয়া থাকিয়া উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ব্যস্ত হচ্চেন কেন, বলেছিতো চাকররা বাড়ী নেই, এলেই গাড়ী পাবেন। ততক্ষণ না হয় এসরাজটা একটু বাজান না। আমরা কি শোনবার যোগ্যই নই?"

এরূপভাবে একজন অপরিচিত পুরুষকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেখিয়া সে যত বিস্মিত ততই আহত হইল। আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফিরাইয়া বারেক ইঁহার দিকে চাহিয়াই সে পরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করবেন; কিছুই আমি আজ পারবো না।"

মিঃ গুহ তখন আর এক পথ ধরিলেন।

"সুরেশ্বরকে আপনি জানেন? সুরেশ্বর বোস? আপনার পাশের বাড়ীতেই থাকে।"

সুষমার রাঙ্গামুখ সাদা হইয়া গেল। বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল; অস্পষ্টস্বরে সে বলিল "না"—

"সে কিন্তু আপনার অনেক কথা বল্লে। আপনার গান শুনেই চিন্‌তে পেরেছিল। আদি গঙ্গার উপর······রোডে 'সুষমা কুটিরে'র ঠিক পাশেই হল্‌দে রংয়ের বাঁহাতি বাড়ীখানা তার।···"

সুষমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ধড়ফড় করিতে লাগিল। উঠিয়া পালাইয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছায় তার পা তাহাকে টানিতে লাগিল, এই অপরিচিত পুরুষের চোখে তার মর্য্যাদা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে কথা সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল এবং এও বুঝিল যে তাহার অমন পরিচয় না পাইলে কখনই তিনি তাহার সহিত এই ভাবের সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেন না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল।

"দেখুন, সংসারে এই রকমই নিত্য ঘটচে। সব মানুষ যদি ভদ্র হতো তা'হলে আর ভাবনা কি? কিন্তু তা'বলে আপনার এ বয়সে এই রকম খেটে খাবার দরকারও তো দেখতে পাইনে কিছু। সবাই অবশ্য রাজা নরেশচন্দ্র না হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও যে মনে কোনই সখ নেই, তাও তো নয়। যাতে তোমার কোন দিকে কষ্ট না হয়, হাতে দু'পয়সা জমে, দু'খানা গহনা গাঁটি গায়ে পর্‌তে পারো, তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা থাক্‌বে। আর এই একজোড়া মুক্তোর দুল এনেছি—"

চেয়ার ঠেলার শব্দে মিঃ গুহকে উত্থিত বোধ করিয়াই তাড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মতই সুষমা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া—তার কোন হুঁস না রাখিয়াই সে বাড়ী ছাড়াইয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিল। ইতিমধ্যে পিছনে একবারও চাহিয়া দেখিল না। তারপর সদর রাস্তায়

আসিয়া যখন পড়িতে পড়িতে গ্যাস পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন কাহাকেও অনুসরণ করিতে না দেখিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল ও তখন মনে হইল, অত জোরে না ছুটিলেও হয়ত বা চলিত। বাস্তবিক তো কেহই তাহাকে ধরিতে আসে নাই। অপর কেহ দেখিতে পাইয়া থাকিলে কি না জানি মনে করিয়াছে? তারপর কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, শুষ্ক অধর ও কণ্ঠ কোনমতে একটুখানি রসসিক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে যেদিকে চোখ যায় চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখনও তার মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ তুমুল হইয়া রাহিয়াছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা—আমি পথের ভিখারী নহিগো"

—রবীন্দ্রনাথ

মানুষের হৃদয়রহস্য যে দেবতাদেরও অপরিজ্ঞাত,—এ কথা অস্বীকার করা চলে না; এবং বোধ করি অস্বীকারও কেহ করে না! কিসে যে তার সুখ, আর কত অল্পেই যে তার দুঃখ, সে বুঝিয়া ওঠাই ভার। নিরঞ্জন যতদিন পরিমলের শিক্ষকতা করিতেছিল, অস্বস্তির তার যেন অন্ত ছিল না, এমন কি একদিন অশান্তি তার সীমা ছাড়া হইয়া গিয়া বাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতেও উদ্যত করিয়াছিল। আবার যখন আপনা হইতে সেই দুরূহ কার্য্যটা তার ঘাড় হইতে নামিয়া পড়িল, অমনি বুঝিতে পারা গেল যে, যেটাকে সে অসহ্য পীড়ন বোধ করিতেছিল, ঠিক সেইটিতেই যেন তার সব চেয়ে বড় সুখের উপাদান অলক্ষ্যভাবেই নিহিত ছিল। বিগত-জীবন প্রিয়তমের মূর্ত্তি মানুষ প্রাণপণে স্মরণে আনিয়া তাহারই ধ্যানস্থ হয়, অথচ প্রাণও কাঁদে। ওই সম্মানিতা ছাত্রীটীর সর্ব্বায়বে কোন হারা-নিধির পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভব করিতে থাকিয়া তাহাকে সহ্য করা যেমন নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন আবার তেমনই বুঝি তাহার মধ্যে একটা দুরন্ত লোভও তাহারও অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রচণ্ড অধিকার স্থাপন করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে পূর্ব্বে বুঝে নাই, পরে বুঝিল। পরিমল যে আর তাহার নিকটে পড়া লইতে আসে না, একদিকে ইহাতে সে খুসী হইয়াও আর একদিকে কিন্তু হইতে পারিল না। আবার নিজের মনের এই ত্রুটীটুকু লক্ষ্যে আসিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মনকে কঠিন-ভাবেসে পীড়ন করিয়া বলিল,—

"খবরদার! পাগলামী করো না; তোমার স্বপ্ন তোমার মধ্যেই থাক, বাইরে তার ছবি যেন কোন মতেই না ফুটে!"—

প্রেসের অল্প স্বল্প কাজ হাতে লইয়া সে ক্রমে তার প্রায় সব টুকুই নিজের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিল এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তার এতদিনের যে শক্তি, যে অধ্যবসায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আবার জাগিয়া উঠিল। একবাক্যে সবাই স্বীকার করিল যে, এমন উদ্দীপনা, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মক্ষমতা আর তীক্ষ্ণধী সর্ব্বদা এসব কাজে পাওয়া যায় না। যারা এতদিন তাহাকে অপ্রকাশ্যে উপহাস ও প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, তা'রাও লজ্জা পাইল।

বস্তুতঃ মানুষের শক্তির আধার কখন যে খালি হইয়া যায় আবার কিসে ভরিয়া উঠে, তার কোন সময় ঠিক করা নাই। উপযুক্ত কার্য্য-ক্ষেত্রের অভাবে কত উৎকৃষ্ট বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, অথবা বপন করাই ঘটে না। নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া যেন তার হারানো শক্তি এই আশ্রয়ে আসিয়াবধি খুঁজিয়া পাইতেছিল। পরিমলের সঙ্গে মাসখানেকের মেলামেশায় তার মরিচাধরা বুদ্ধির কৃপাণে শান পড়িয়াছে; এবার কাজের মধ্যে ডুবিতে পাইয়া তার উপরের সমস্ত ধুলী জঞ্জাল যেন ধুইয়া গেল। এখন সে আর তত অন্যমনস্ক হয় না; মাসমাহিনার টাকাগুলা দিতে আসিলে খাজাঞ্চিকেই উহা জমা রাখিতে বলিয়া গোটাকতক শুধু চাকরমহলে বাঁটিয়া দেয়। হরে খানসামার দল মুখ বাঁকাইয়া উহা গ্রহণ করে ও নিজেদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলে, "বাছা হনু আমাদের এবার চালাক হচ্চেন দেখি যে!" আর একজন বলেন "হবে নাই বা কেন? এখন যে পেটে রাজা সায়েবের ভাত পড়েচে। ও-ভাতকে হজম করে চলতে পারা কঠিনরে ভাই; ওর জোরে অনেক 'পৌটাচুন্নির বেটা চন্দন বিলাস' হয়ে উঠ্‌লো! তা দেখিস্‌নে?"

যে খাতাখানার কথা সেদিন পরিমল তার স্বামীর কাছে বলিতেছিল, সেখানার মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন নিবিষ্ট হইয়া কি লিখিত। সেটার আরম্ভ ছিল এই রকম—

"এই মলাট-ছেঁড়া চার পয়সা দামের খাতাখানা হাতে পেয়ে আজ হঠাৎ ডায়রি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। মনে যে পড়লো তা সেটা কিছু আর বিচিত্র নয়! কতকালেরই যে অভ্যাস ছিল। কিন্তু নয়ই বা কেন? আমার এ জীবনটার সকলই যে বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কারগুলো এখনও যে কেমন করেই না মরে গিয়ে বেঁচে আছে এবং সুযোগ পেতেই মাথা তুলে খাড়া হচ্চে, এইটেই তো ঘোর আশ্চর্য্যের বিষয়! নিজেই আমি অবাক হয়ে গিয়ে ভাবচি যে তাহ'লে আমার দ্বারা এখনও আবার এ পৃথিবীর কোন কোন কাজ কর্ম্মও চালিয়ে নিলে চলে! আশ্চর্য্য, ভারি অশ্চের্য্য লাগ্ছে কিন্তু!

"আচ্ছা, আমি আগে কি ছিলুম, সেটাও একটু একটু করে মনে কর্ব্বার চেষ্টা করা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ নয়! যা' ছিলুম আর এখন যা' হয়ে দাঁড়িয়েছি এ থেকে আমিই আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে, তা আর পাঁচজনে কেমন করে পারবে? কিন্তু সে পারবার কিছু দরকারও ত নেই। সে লজ্জা আমি আমাকে যে কোন মতেই দিতে পারবো না।—না, না, আমার অতীত! আমার সোনার স্বপন! আশার আনন্দে উৎসাহে সম্মানে ভালবাসায় ভরা আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের অতীত! যত মাধুর্য্য যত আকর্ষণই তোমার মধ্যে থাকে থাক, তুমি শুধু আমার ধ্যানধারণার মধ্যেই লিপ্ত হয়ে থাক। পথের ভিখারী নিরঞ্জনের কাছে তুমি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মত গোপন আকাঙ্ক্ষার ধন হয়েই থাক, এই কর্কশ বন্ধুর শুষ্ক বর্ত্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আমি তোমায় আঘাত করবো না, লজ্জা দেব না।

"নিজের কথা ভাব্‌তে গেলেই মনে হয় এর আগে যে জন্মটা আমার চলছিল, সেটা যেন শেষ হয়ে গিয়ে এখন আর একটা নূতন জন্ম চল্‌ছে! আর বস্তুতঃও তো তাই! আমার সে জন্মে আমার চেহারাখানা ঠিক কার্ত্তিকের মতন নাই থাক্‌, ঘরে পরে সবাই যে আমার রূপের তারিফ করেছে, সে তো আমি নিজের কানেই শুনেছি। আর এখন, আমায় দেখলে লোকে শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কেঁদে ফেলে—পালিয়ে যায় সেও আমি জানি। জন্ম আমার ঠিকই বদলে গেছে, তবে এবারে জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি বলেই এত জ্বালা! পুরানো কথা মধ্যে যেমন কিছুদিন ভুলে গিয়েছিলেম, তেমনি বরাবরের জন্য একেবরেই যদি ভুলে যেতেম, সে যেন ঢের ভাল হতো। তবে দুঃখ এই যে, জন্ম নতুন পেলেও এবারে আর কচি ছেলেটী হয়ে জন্মে মায়বুকে ঠাঁই পেলেম না। আর একটু একটু করে বাড়্‌তে গিয়ে ছেলেরা যে অবসরটুকু পেয়ে নেয়, সেও আমার ভাগ্যে ঘুটলো না।—একবারে এই বাজপড়া তাল গাছের মতন আমাকে নিয়ে আমার এই নবীন জন্ম আরম্ভ হলো!

"আচ্ছা, বাড়ী ছিল আমাদের চট্টগ্রামের যে দিকটায়, সে সবই তো দেখছি ঠিক ঠিক মনে পড়ে যাচ্চে! মধ্যে কিন্তু এসব কথা এমন করে মনে করতে পারতাম না। আমার ঠাকুরদা মশাই শুনেছি নেহাৎ নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর এক বিশ্বাসী (!) আমলার কারসাজীতে পড়ে সমস্ত জমিদারীটি হারিয়ে ফেলে মনের দুঃখে এইখানে এসে বাস করতে থাকেন, এই আমার মার কাছে শুনেছি, তার আগে তিনি গাজন হাটের এগার আনির জমিদার ছিলেন।

"আমার বাবাকে আমার বেশ স্পষ্ট করেই মনে আছে। ফরসা রং, দেড়হারা পাতলা লম্বা চেহারা, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কি

উদার মনই তাঁর ছিল! আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। একবার সূর্য্যাস্ত খাজনার দায়ে ঐ গাজন হাটের তালুক—তখন আর তা এগার আনি নেই,—তার ষোল আনাই তখন গিরিশচন্দ্র মিত্রেরই হয়ে গেছে—সেই তালুক লাটে ওঠে। বাবা খুব সামান্য দামে তাঁর সেই নিজের পৈতৃক বিষয় একজন চাপরাসীকে দিয়ে কিনিয়ে রাখেন এবং পরের দিন নিজের হাতে পত্র লিখে যারা তখন তাঁর ন্যায্য বিষয় অন্যায্য ভাবে ভোগ করছিল, তাদেরই খবর দেন যে কেনবার টাকাটা পেলিই তিনি ওদের তালুক ফিরিয়ে দেবেন। হলোও তাই। আমার আজও সেই কথা মনে কর্‌তে আহ্লাদে আর গৌরবে বুক কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! আমি সংসারে এসে কার জন্যে কি করলুম?

"পিতৃহীন হয়েছিলেম, নিতান্ত অসময়ে। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কল্‌কাতায় পড়তে গেছি, বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হলো! ভাই বোন আমার আর কেউ ছিল না। মার পক্ষে বড্ডই কষ্টকর। ছুটীর সময়টুকুই তাঁর কাছে থাকি, বারমাস তিনি একলা।

"কল্‌কাতার হোষ্টেলে যাঁরা বাস করেছেন, আমাদের মতন পাড়াগেঁয়ে বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চলের ছেলে গেলে তাদের সেখানে যে কত বড় দুর্দ্দশা ঘটে সে হয়ত তাঁদের জানা আছে! কোন্ সময় অন্যমনস্ক হয়ে একজন 'কেডারে ডাহে?' বলে ফেলেছে,—আর রক্ষা আছে! খোঁজ করে করে তাই, নিজের স্বজাতী (?) দেখেই ভাব করে ফেলা যেত এবং আমার এক ঘরের পড়সী হলেও পশ্চিমবঙ্গকে 'দূরে পরিহার' চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকতেম। কারণ, আমাদের পক্ষে তাঁরা ছিলেন একটু 'দুর্জ্জন'।

"কালীপদ আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। জীবনে সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করতে যাওয়া,—আর

কি ঘনিষ্ঠ যোগই যে সে হয়েছিল! এত ভালবাসা বোধ হয় আর কারুকেই কখন বাসতে পারিনি, আর না,—বাসতে পারবোও না। এখন কি আর সে ভালবাসবার শক্তিই আমার মধ্যে আছে? মন ছিল তখন একটা কাদার তালের মতন, তাকে রকম বেরকম করে ছাঁচে ঢেলে নিলেই হলো। এখন হয়েছে সে একখানা নিরেট পাথর। তাকে ভাঙ্গাও যায় না, গড়াও যায় না।

"কালীপদ আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিল বটে; তবু আমার মতন নয়। সে তার জীবনের মস্ত বড় কথাটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আমি হলে তা' পারতুম না। যাকে ভালবাসলেম, তার সঙ্গে যদি একটা মস্তবড় আড়ালই রেখে দিলেম, তাহলে আর প্রাণে প্রাণে যোগ হবে কোনখান দিয়ে? গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে যদি একটা প্রকাণ্ড পাহাড় গেঁথে ওঠে, তাহলে যুক্তবেণীর সব মহিমাই যে তুচ্ছ হয়ে যায়! কালীপদর যে আমায় না জানানো গোপন কথা ছিল, সে আমি জানতে পারলেম একেবারেই অসময়ে।—যেদিন পুলিসের লোকে আরও কজন ছেলের মধ্যে তারও ঘর তোলপাড় করে' একটা ছোট্ট রকম বোমার সরঞ্জামের সঙ্গে তাকেও ধরে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ও কোমরে বেঁধে নিয়ে চলে যায় সেই ঘোর দুর্দ্দিনে। আমাকেও দুদিন একটু টানাটানি করেছিল; কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ বুঝে শেষটা ছেড়ে দিলে।

" 'পদ'র সঙ্গে শেষ দেখা তার আন্দামানে যাবার আগের দিন। দেখা হতেই খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। হাত তার বাঁধা। দণ্ডিত অপরাধী পাছে কিছু করে বসে—তার কিন্তু সে মতলবই নয়। খুব প্রফুল্ল হয়ে সোৎসাহে অনেক কথাই সে অনর্গল বলে গেল। তারপর সব্বের শেষ অনুরোধ আমায় এ জন্মের মতই সে জানিয়ে দিলে।

"'রমেশ! তোমার তো আজও বিয়ে হয়নি, তুমি সুখদাকে বিয়ে করতে পারবে না? তাহলে এ জন্মটার মতন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘানি ঘোরাই এবং যাতে শীঘ্রই আর একটা নূতন জন্ম পাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেখি।'

"আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম 'সুখদা কে?

"'কেন তোমায় তো আমার বোনের কথা আমি বলেছিলুম। সুখদা তারই নাম। ধরো এই আমার মতনই তাকে দেখ্‌তে।—পারবে না?'

"আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করলেম 'কেন পারবো না, ঈশ্বর সাক্ষী তোমার বোনের জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

"'পদ' খুসী হয়ে আমায় তার বাঁধা হাত দিয়ে জীবনের শেষ আলিঙ্গন চুকিয়ে দিলে। সেই শেষ! জীবনের প্রথম প্রভাতে যা পেয়েছিলেম, জীবনের প্রথম প্রভাতেই তাকে হারিয়ে ফেল্লেম! বিশ্বাসের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে সে যাকে আমায় সঁপে দিয়ে গেল, তাকেও আমি নিজের পাপে নষ্ট করে ফেলেছি—হারিয়ে গেছে। কিন্তু দুজনকার স্মৃতিই আজও আমার বুকে আগুন হয়ে ঠিক্‌রে পড়চে, উল্কা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ভুলতে আজও একজনকেও তো পারিনি!—আর কি কোন দিন পারবো?

"—কে আস্‌চে? তিনিই কি? কেন তাঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে? সুখদা যদি রাণী হতো, তা'হলে তাকেও ঐ রকম সুন্দর দেখাতে পারতো। মানুষে মানুষে মিল থাকে দেখেছি, কিন্তু এতটা মিল এর আগে কখনও দেখিনি!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এত নহে তৃণদল ভেসে আসা ফুল ফল
ব্যথা ভরা মন এ যে ব্যথা ভরা মন, মনে রাখিও।

—রবীন্দ্র নাথ।

প্রবল মানসিক উদ্বেগে ও উত্তেজনায় সুষমার সে রাত্রে জ্বর আসিল এবং দিন দুই সে সেই জ্বরের কষ্টে ও মনের কষ্টে বিছানা লইয়া রহিল।

নিজের উপরে তার যেন ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল। এমন কালামুখ তাহার, যে সেকি কোথাও বাহির করিবার উপায় নাই? যাক্ তবে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিষেভরা সাপের মত এ জন্মটা তার লোকচক্ষের বাহিরে, শুধু তাহাদের নির্ম্মম আলোচনার মধ্যেই কাটিয়া যাক! মনে পড়িল,—নরেশ সেদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন "স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নাই? লজ্জা নাই?" সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গলদশ্রু-নেত্রে দু'হাত জোড় করিয়া আত্মগতই কহিতে লাগিল, "দেবতা আমার! দেবতা আমার! তোমার দিব্যদৃষ্টি যে সে দিন এত সূক্ষ্মভাবে আমার এই অপমানগুলা দেখতে পেয়েছিল, তা তো আমি জানিনি! কেন তবে আমার অজ্ঞতার আব্দার গ্রাহ্য করলে?" তারপর সবিস্ময়ে সে ভাবিল, যে পৃথিবীতে নরেশচন্দ্র আছেন, মিঃ গুহর মত লোকেও সেখানে কেমন করিয়া জন্মায়!

ডাকের পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। সুষমার নামে কালে ভদ্রে একখানা পত্র আসিলে সেখানা নরেশচন্দ্রের নিকট হইতেই আসে। আজও সেই বিশ্বাসেই পরিপূর্ণচিত্তে সাগ্রহে পত্রখানা লইয়া মাথায়

ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ সুষমার লক্ষ্য হইল, উপরের হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের নহে এবং খামখানা অন্যছাঁদের। চিঠি লিখিবার লোকের বালাই তাহার কোনখানেই তো নাই, কে লিখিল তাহাকে এই চিঠি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মোটা খামখানা সে মাথার কাঁটা দিয়া খুলিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত হাতের লেখা, আর সম্পূর্ণরূপেই অবমাননাজনক ইহার বর্ণবিন্যাস! ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া চারি পৃষ্ঠা চিঠির শেষে নামের স্বাক্ষরটা উল্টাইয়া দেখিতে গেল। সেখানে লেখা আছে—"তোমার একান্ত দর্শনাভিলাষী সুরেশ্বর বসু।" চিঠির উপরে এ বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর নম্বর দেওয়া রহিয়াছে। তখন মিঃ গুহর কথা তাহার স্মরণ হইল। তাহার প্রতিবেশী সুরেশ্বর বোসকে সে চেনে কিনা এই প্রশ্ন তিনি তাহাকে সেদিন কহিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর মিঃ গুহর বন্ধু। প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া গেল। অতি সামান্য পঠিত পত্রখানা সে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া তাহা গদির তলায় তদবস্থাতেই রাখিয়া দিল। সে পত্রে যে সব কথা লেখা হইয়াছে তাহার আভাস দু'চার পংক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সেদিন মিঃ গুহের মুখে সে কথা শুনিতেও তো তার বাকি নাই। রাজা নরেশচন্দ্র তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে এক্ষণে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদপেক্ষায় অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাহারা উহাকে রাখিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি অনেক কথাই সেই পত্রে লেখা আছে। পত্রখানা নরেশকে দেখান উচিত বোধেই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল না।

কানাই সিং বিস্তর রাগারাগি করিয়াও তাহাকে রাঁধাইতে না পারিয়া বিষম ক্রোধে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল, "তা'হলে হামিও আজ আর রুটি বানাবে না। এমন করে রোজ রোজ উপোস দিলে যে তোর

জান বার হয়ে যাবে খুকি বউয়া! থোড়া কুচ তো আদমী মুহেমে দেয়।”

তারপর নিজের তৈরি আটার রুটি ও আলুর তরকারি বানাইয়া এক ঘটি জলও থালায় খাবার আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল “লে’ এখন উঠে বৈঠকে খা’লে বাবা; দুটো খা’লে।”

সুষমার চোক দিয়া এতক্ষণের পর তাহার চোক নাক জ্বালা করিয়া অকথ্য যন্ত্রণারাশি তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া বাহির হইল। নিজের যে অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথা তার মনের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রচণ্ডবলে আঘাত করিতেছিল, এই একমাত্র স্নেহ কবিবার বুড়া সাথীটির এইটুকু স্নেহাভিব্যক্তিতে সেই অব্যক্ত দুঃখ তাহার ব্যক্তের সীমায় ফিরিয়া আসিল। সে খাবার কোলে করিয়া ক্রমাগত চোখই মুছিতে লাগিল।

কানাই সিং সান্ত্বনা দিয়া বলিল, “খেয়ে লে বউয়া; খেয়ে লে, তোর অসুখ কুচ্ছু বাড়বে না, আমার কথায় বিশোয়াস্ কর। কচি বাচ্চা, কত উপোস করবি বল্ দেখি?”

অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া সুষমা তার পুরাতন বন্ধুর যত্নের দান মোটা রুটির দু’এক খানা খাইয়া তখন বুঝিতে পারিল, এটুকু পাওয়ার তাহার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া সে তখন স্নেহকারীকে একটু খুসী করিবার জন্য তাহার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, “সিং-জী! আচ্ছা তোমার বউমেয়েরা সেখানে গেলে তোমার রুটি গড়ে দেয় তো? সেখানে তো নিজে রাঁধতে হয় না?”

কানাই সিং একগাল হাসিয়া জবাব দিল “আরে নারে বউয়া! সেখানে হামি কিসের দুখে নিজে রাঁন্‌তে যাবে? কিস্‌মতিয়া, বহুয়া হামার বড়া পুতৌ নান্‌কিয়া মাই সবকোই রুটি পেকিয়ে দেয়, হামি বৈঠে বৈঠে খাই। সেখানে রুটি বড় মিট্ লাগে। পানীয়ে

মিঠা বহুত। আহা কব্‌ না কব্‌ সোহাতি খেতে পারবে, সে তো না জানে কুছ!”

সুষমা অকস্মাৎ কি যেন একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা ঐটুকু পরিতাপের বেদনার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে দেখিতে পাইল। সে একেবারে কাঙ্গালের মতন ব্যাকুল হইয়া দুচোকভরা আগ্রহ লইয়া কানাই সিংহের মুখের পানে চাহিল।

“সিং-জি! আমায় তুমি ফেলে যেও না! বরং আমায় সঙ্গে করে তোমার দেশে নিয়ে চলো, তাই নিয়ে চল সিং-জি! যাবে?

কানাই এই কাতর ও ব্যগ্র আবেদনে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাবেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আপ্রান্তমুখ দন্ত বিকশিত করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিয়া উঠিল “হামার বাড়ী গিয়ে কি তুই থাকতে পার্‌বি খুঁকি বউয়া! সে যে মাটির বাড়ী, তার ফুসের চাল। কি করবো গরীব আদ্‌মী। রাজা বাবু তোকে যেতে দেবে কেন?”

সুষমা উত্তেজিত আবেগে অধীর হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল “খুব দেবেন, খুব দেবেন। আমি কোথাও সরে যেতে পেলে তিনিও যে রাহুমুক্ত হন,—কেন দেবেন না? কিন্তু আমি গেলে তারা কি আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেবে, সিং-জী? আমি কোথায় থাকবো?” সুষমার অর্দ্ধেকটুকু উৎসাহ এই চিন্তাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটার টানের মতই চলিয়া গেল।

কানাই সিং জিব কাটিয়া ত্রস্তস্বরে “সে কি রে বাবা! কেন তুই কার কাছে কি কছুর করেছিস্‌ রে?” বলিয়া সস্নেহআদরে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে খটাখট খটাখট করিয়া অসহিষ্ণুভাবে কাহাকে কড়া নাড়িতে শোনা গেল। রাজাবাবুর

পত্রবাহক বিশ্বাসে দুজনেই ত্রস্ত হইল। নতুবা এমন সুখজনক আলোচনার মধ্য হইতে কানাই সিংকে এত শীঘ্র কেহ উঠাইতে পারিত না।

খানিক পরে উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাবাবুর লোক নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব সুষমার দুদিনের কাজ কামায়ের কৈফিয়ৎ কাটিতে আসিয়াছেন। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে ববুয়ার এখন বড় অসুখ, দেখা কিছুতেই হইবে না, তাহাতে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শেষকালে কানাই সিংকে বিরক্ত দেখিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহাকে বলেন, দেখা করাইয়া দাও তো এটা পাইবে! কানাই তাঁহাকে উত্তম মধ্যম ঝাড়িয়া দিত, শুধু পাছে ববুয়ার মনীবকে চটাইলে ববুয়া তার উপর রাগ করে, তাই সে পারে নাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো গলায় সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "অমন নোকরী তুই করিস্‌নে খোঁকি! হামি রাজাবাবুকে বল্‌বো তোর টাকায় আঁটচে না আর কিছু বেড়িয়ে দিতে। হামার রাজাবাবু তেমন নয়।"

কানাই সিংহের আনিত সংবাদে এদিকে সুষমার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া সে দ্বারের দিকে সভয় দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল "কিছুতে না, কিছুতে না, সিং-জী! দেখ যেন সে আমার বাড়ীতে না ঢুকতে পারে। তুমি যে করে হয়, তাড়াও ওকে, তাড়াও।—যদি এখানে এসে পড়ে—শিগগির যাও।"

বিস্মিত কানাই সিং কি বলিবার জন্য মুখ খুলিতে গেলে, দারুণ অধৈর্য্যের সহিত সে তাহাকে ঠেলিয়া দিল' "আঃ যাও না সিং-জী, এক্ষুণি হয়ত এখানে এসেই উপস্থিত হবে।"

কানাই সিং প্রস্থান করিলে ছুটিয়া আসিয়া সুষমা ঘরের সব

কয়টা দরজা জানালায় খিল আঁটিয়া দিল। তার হাত পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে।

বিশ্বপ্রিয় বাবু পরের দিন সকাল বেলায় আসিয়া নিজের নাম ছাপা কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন "সবিনয় নিবেদন,—রাজাবাহাদুরের অনুরোধে আমিই আপনার জন্য মিঃ গুহর বাড়ীর চাকরী জোগাড় করিয়াছিলাম, যদি সেখানে কোন অসঙ্গত কিছু ঘটিয়া থাকে, তার জন্য আমিই প্রধানতঃ দায়ী, এবং আমিই তার জবাব দিতে বাধ্য। সেজন্য আমার সব কথা জানাও উচিত। অতএব যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মিনিট কতকের জন্য আপনার বাহিরের ঘরে আপনার কোন বিশ্বাসী লোকের উপস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে।"

পত্র লেখার ধরণে বিশেষতঃ পূর্ব্বেই নরেশের পত্রে তাঁহার 'বন্ধু' বলিয়া ইহার উল্লেখ থাকাতে সুষমা কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার ধারের অব্যবহারে পতিত আসবাবহীন বৈঠকখানা ঘরখানায় বিশ্বপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বিশ্বপ্রিয় তাহাকে নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সবিনয়ে কহিল, "মিঃ গুহর কাছে কালরাত্রে শুনলুম, আপনি আর তাঁর স্ত্রীকে বাজনা শেখাতে যাচ্চেন না; আপনার না যাবার কারণ জানতে কাল তিনি এখানে এসেছিলেন, আপনি দেখা করেন নি, অপরন্তু আপনার চাকরের হাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন।

সুষমা আসিবার সময় নিজের রুক্ষচুলগুলাকে টানিয়া মাথার উপর কুণ্ডলী করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছিল, চোখে একজোড়া চোক ওঠায়

সময়কার নীল চশমা ও গায়ে একখানা মোটা র‍্যাপারে সে নিজেকে লুকাইবার ইচ্ছায় ঢাকা দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দিকে চোখ পড়িতেই বিশ্বপ্রিয় যেন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। রাজা নরেশের আশ্রিতা যে এতটাই ছেলে মানুষ এ ধারণা তাঁর মোটেই ছিল না। আরও বিস্ময়বোধ হইল তার নিরাড়ম্বর ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া। —এ যেন একটী নেহাৎ সাদাসিদা স্কুলের মেয়ে। একে আর কিছু যে মনে করিতেই পারা যায় না।

ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে সুষমা উত্তর করিল, "তিনি যা বলেছেন সবই সত্যি। শুধু তাঁকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন, আমি তাঁব বাড়ী আর চাকরী করবো না, তাঁরা যেন দয়া করে আমায় বিরক্ত না করেন।"

অনুমানে সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপ্রিয় কিছু দুঃখিত কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মৃদু মৃদু বলিলেন "রাস্‌কাল! আচ্ছা তাকে আমি দেখে নেবো। কিন্তু আপনার কাছে আমিই অপরাধী হয়ে পড়লেম। আচ্ছা এবারে আমি বিশেষ জানাশোনা ভদ্রঘর দেখে আপনার জন্য খুব ভাল চাকরী ঠিক করে দোব দেখবেন।"

সুষমা নতমুখে বলিল "আমার আর চাকরীর ইচ্ছা নেই।"

বিশ্বপ্রিয় সলজ্জে মাথা হেঁট করিলেন এবং তারপর নত মুখেই কহিলেন "সংসারে মিঃ গুহ অল্পই জন্মায় জানবেন।"

সুষমা কহিল "তা, আমি জানি, কিন্তু আমার স্থানও যে বড়ই স্বল্প-পরিসর। ক'জন আমায় বাড়ী ঢুকতে দিতে রাজী হবেন?"

এই অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক আত্মাভিব্যক্তিতে বিশ্বপ্রিয় একদিকে যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে তাঁহার আলোচনার পথও মুক্ত হইয়া গেল। তিনি তখন ঘরের মধ্যের দ্বিতীয় চৌকিখানি টানিয়া দিয়া সুষমাকে বলিলেন "বসুন, আপনার সঙ্গে

এ সম্বন্ধে আমি একটুখানি আলোচনা করিতে চাই। আপনার বিষয়ে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আমার যতটা জানা আছে, আর নিজেও যেটুকু আজ আপনাকে দেখেও আমি বুঝেছি, তাতে সাধারণ সমাজ আপনাকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি সব কথা জানিয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করবো এবং ধরে নিচ্চি, তাতেও যদি না কৃতকার্য্য হতে পারি, তা হলে—”

বিশ্বপ্রিয় একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল “আমার সমস্ত খবর পেয়েও কি ব্রাহ্মসমাজ আমায় তার মধ্যে স্থান দিতে প্রস্তুত হবে?”

প্রশ্নের ধরণে, আর ঐ ‘সমস্ত’ কথাটার উপর জোর দিয়া বলাতে বিশ্বপ্রিয় মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া এক রকমে জবাব তৈরি করিয়া লইলেন—‘দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম’ সমাজ সে কথাটা জানে বৈ কি!”

সুষমা নিজের অস্পষ্ট হইয়া পড়া কণ্ঠস্বরকে সুস্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল “জন্মগত অপরাধের কথা নয়; যে অধিকারে মিঃ গুপ্ত আমায় অবমানিত করাকে অপরাধ বা পাপ বোধ করেন নি, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কি আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি বদল করতে পারেন? অথবা আমি যা আছি, লোকের মনে তাহাই থেকে যাব, অথচ যে দেবদেবীদের আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, শুধু বাহিরে স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবো যে তা করিনে?—আর যে নির্গুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার ধ্যান বা ধারণা কাছেও গিয়ে পৌঁছতে পারে না, সকলের মধ্যে সগর্ব্বে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তাঁহারই উপাসক আমি? এত পাপের মধ্যে আবার এতবড একটা প্রতারণা কেন করতে যাব? হিন্দুসমাজে মিশবার অধিকার আমার নাই থাক্‌, তবুও মনে প্রাণে যে আমি হিন্দুই।”

এর পর আর বিশ্বপ্রিয় কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দু'একবার ক্ষীণ ভাবের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূতবোধে শেষে অনেক চেষ্টা করিবার পর নিজের সকল দ্বিধা ও লজ্জা সংবরণ করিয়া তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিতই মরিয়াভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—

"এই সামান্য ক্ষণের কথায় বার্ত্তায় আপনাকে আমি চিনেছি। রাজার কথা,—সত্য কথাই বল্‌বো—পূর্ব্বে আমার তেমনি বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন আমি আপনার তেজস্বিতায় ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছুই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে নিতে পেরেছি। আপনি আমাদের সমাজে আসতে চান; আমি সযত্নে আপনাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতে আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হবো। আপনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে না আসতে চান, তা'হলে আপনাকে নিরাপদ ও সম্মানের স্থান দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিতই আপনাকে সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্টের হিসেবে বিবাহ করতেও সম্মত জান্‌বেন। আপনার মত মহিলার এ অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যারা থাক্‌তে দেয়, তারা অপরাধী।"

সুষমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহাঁকে যোড়হাতে নমস্কার করিল, কৃতজ্ঞতার সজলকরুণস্বরে সে কহিল, "আপনি আমায় যে কথা আজ মুখেও বল্‌তে পারলেন, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা' আমার চিরদিনই মনের ভিতর গাঁথা থাক্‌বে। কিন্তু আমি যে কোন সমাজের লোকেরই স্ত্রী হবার যোগ্যা নই। আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আপনারা শুধু নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেন, এই আমার শেষ ভিক্ষা।"

বিশ্বপ্রিয়রও আর বলিবার কথা যোগাইল না। তখন দু'জনেই বিদায় লইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"হত ভাল যদি হতে কুৎসিত অথবা সে হ'তে বলী
ভয়ে আসিত না ভালবাসিত না চরণে যেত না দলি।"
—তীর্থ সলিল।

অশান্তির আগুন যখন জ্বলিতে আরম্ভ হয়, ইহার যেন আর শেষ দেখা যায় না। কোথা দিয়া ও কেমন করিয়া যে রাজা নরেশচন্দ্রের সহিত সুষমার বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরটা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল বলা কঠিন, কিন্তু কলিকাতার ধনী মহলে যাঁহারা ও-সকল সংবাদ রাখিয়া থাকেন এবং নরেশচন্দ্রের সুন্দরী আশ্রিতার সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ একটু আগ্রহ মনের মধ্যে এতদিন চাপা ছিল, তাঁদের মধ্যের দু'এক জন ধনীলোকের মোটর সুষমার দরজায় ধাক্কা মারিয়া গেল। কেহ বা পত্র কেহ বা বন্ধু পাঠাইলেন। কানাই সিং হুকুমবরদারী করিল। রাজার পত্রবাহক ভিন্ন সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হুকুম ছিল,—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা কানাইয়ের স্বভাব, কানাই সে বিষয়ে কোন ত্রুটী দেখাইল না।

শেষে ডাক্তার করুণানিধান বাবু দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কি করা উচিত ঠিক না পাইয়া কানাই সিং মুনিবকে খবর দিতে গেল। ডাক্তার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্‌সিলে লিখিয়া দিলনে,—"সে যে কাহারও সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা স্বতন্ত্র। তিনি সুষমার বাল্যকালে কতবার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আসিয়া তার গান শুনিয়া গিয়াছেন রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন যে! তা তখন হইতেই তিনি সুষমার

জন্য পাগল, কেবল নরেশের বন্ধুত্বের খাতিরেই এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। তাঁর স্ত্রী এখন মারা গিয়াছে।—সুষমার রূপ ধ্যান করিয়াই তিনি আর নূতন করিয়া সং সাজিতে পারেন নাই।"

কানাই সিং ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "আজ নয়, আপনি কাল আসিবেন।" এদের উদ্দেশ্য সেও এখন বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সুষমার কার্য্যে তার বুক অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহা চূর্ণ হইতে বসিল, ভাবিয়া সে মর্ম্মে আহত হইল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিজের খাটিয়ায় বসিয়া পড়িয়া সবেমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে "সীতারাম! সীতারাম!"—এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল "সিং-জী!"

মুখভার করিয়া কানাই গিয়া নিরুত্তরে কাছে দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের মেজেয় বসিয়া সুষমা চোখ মুছিতেছে, বোধ করি কাঁদিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সে আহত-শিশুর ন্যায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মর্ম্মবিদারীস্বরে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "সিং-জী, ভাইয়া! আরতো আমি এদেশে থাকতে পারচিনে, আমায় তোমার দেশে তুমি নিয়ে চলো।"

কানাই সিং এই দুদিনের ব্যাপারে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াই ছিল। সে যেমন প্রীত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুখিয়া উঠিল "বউয়া! তুই কাঁদিস্ নে, তুই হামার বেটী আছিস, বেটীসে বড়্ করে হামি তোকে মেনিছি, হামি তোর হুকুম পেলে ওই দুষমন্-বাবুদের নাক ভেঙ্গে দিতে পারি। তুই হুকুম দে, দেখি তোকে কোন জানোয়ার কাঁদাতে আস্‌তে পারে।"

সুষমা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "না কানাই ভাইয়া! কারুকে আমি কিছু বলবো না ওদের দোষ কি? ওরা

চিরদিন আমাদের মতন লোকেদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে আসতে পেরেছে, পার্‌ছে, ওরা তাই জানে। আমাদের মধ্যেও যে মানুষের প্রাণ আছে, ইজ্জতবোধ আছে, তাতো কোনদিন কেউ ভাবতে শেখেনি। সমাজ তো আমাদের রক্ষার কোন উপায় করেনি, কেউতো আমাদের দোরে দোরে গিয়ে উদ্ধারের উপদেশ শোনায়নি, আমাদের নিয়ে শুধু পুতুল খেলাতেই পেরেচে। আমরা যে মানুষ সেটুকু শুদ্ধু ভুলে গিয়েছে। ওদের বলবার আছে কি? এর জন্য আমরাও যে দায়ী। শুধু ওরাই নয়, আমরাও যে ভুলে গিয়েছিলুম যে আমরাও মানুষ।"

কানাই সিং রাগিয়াই ছিল, সে তেমনি উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "রাজাবাবুরই তোমার খবর না লেওয়া খুব কসুর হচ্চে। হামি এখনি গিয়ে সব হাল ওঁকে জেনিয়ে আসচি।"

"সিং-জী ভাইয়া! আমায় একলা রেখে তুমি যেওনা, তবে আমায় শুদ্ধ সঙ্গে করে নিয়ে চলো।"

কানাই যেন এতক্ষণের পর নিজে আশ্বস্ত হইয়া উহাকেও আশ্বস্ত করিতে চাহিয়া বারবার করিয়া বলিতে লাগিল; "তাই চল্ বউয়া! তাই চল্। হামার রাজাবাবু তোকে দুক্ষু পেতে দেবে না; এমনি করে থাকিলে তুই মরিয়ে যাবি।"

বেলা তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে পাখার হাওয়ায় গ্রীষ্মতাপ কিছুই অনুভূত হইতেছিল না বটে; তবে বহির্জগতে তখনও পচা ভাদ্রের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ বেলা অবসানের পথে আলস্য শ্লথ গতিতে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিল, যাইবার জন্য তার বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না। পশ্চিমাকাশে সূর্য্যের দেখা নাই; কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী রাজার শাসনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার শাসন প্রভাব কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শাসিত প্রদেশকে

প্রভাবান্বিত রাখে, তেমনি তাঁর মহিমাজাল তখনও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গৌরব বিস্তৃত করিতেছিল। নরেশচন্দ্র নিজের আফিস ঘরে দু'একজন কর্ম্মচারীর সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন; এইবার উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় কানাই সিং দ্বারে দাঁড়াইয়া বারকতক কাশিয়া নিজের পরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া লইল এবং তারপর দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া ডাকিল "মহারাজ!"

"কে? কানাই সিং?—যুগল! পালমশাই! আজ আমি এইবার উঠি, কাল আর একবার ঐ খসড়াটা ভাল করে দেখেশুনে দেওয়া যাবে।"

নরেশ কানাই সিংয়ের কাছাকাছি হইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের খবর ভাল তো কানাই সিং?" হাতে চিঠি আছে কিনা উদ্বিগ্ন চোখে দেখিয়া লইলেন।

কানাই সিং দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "খবর কাঁহা কুছু আচ্ছা হ্যায় মহারাজ! বউয়াজী বহুত তক্‌লিবসে হ্যায়। হাম উন্‌কো সাথ্‌ করকে হিঁয়া লে আয়া।"

"নিয়ে এসেছ! তাকে!—" নরেশ যেন ভয়ত্রস্তভাবে চমকিয়া উঠিলেন।—"কি হয়েছে তার? আমায় খবর দিলেই হোত।"

কানাই সিং সুষমাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়াছিল, একেই সে সুষমার প্রতি 'মহারাজের' ব্যবহারকে প্রশংসা করিতে কোনমতেই সমর্থ হইতেছিল না, তার উপর ইঁহার সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অথচ সুষমার অর্থাভাবে অবমাননাজনক চাকরী করিতে যাওয়া, বিশেষ তাহারই পরিণামে এত দুঃখভোগ, তাহার মনকে অত্যন্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে সুষমার আগমন সংবাদে নরেশকে বিপন্নভাবাপন্ন দেখিয়া সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। মনীবের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া সে অভিমান-পরিপূর্ণ

বিরক্তস্বরে জবাব দিল, "মহারাজ! হুকুম ফরমাইয়েতো হাম হামারা বউয়াজীকো আপনা দেশপর—যাঁহা হামারা বেটী পুতৌ হ্যায়, হুঁয়াই লে চলে?—লেকেন গরীব পরবর!—গরীবকা বাচ্চা কো উপব এইসা বেখেয়াল হোকে রহ্‌না ঠিক বাত নেই হ্যায়!"

ভৃত্যের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নরেশচন্দ্রের চিন্তা-বিপন্নতা গভীর লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। আত্মচিন্তায় বিরত হইয়া তখন আস্তে আস্তে উহাকে প্রশ্ন করিলেন "সুষমা কোথায়?"

গাড়ীর মধ্যে ফটকের বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কানাই সিংয়ের সহিত অগ্রসর হইলেন।

পিছনে কর্ম্মচারী দুজনের মধ্যে যুগল তখন নিম্নস্বরে অপরজনকে সম্বোধন করিল "ব্যাপারখানা শুন্‌লেন তো পাল মশাই! বাইজী সাহেব যে বাড়ী চড়োয়া হয়ে এসে উপস্থিত হলেন দেখছি! আসা যাওয়া কমেছে কি না, অম্‌নি গেরো কষতে বাড়ী বয়ে ছুটে এসেছেন।"

পালমশাই চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া মুচকিহাসির সহিত টিপ্পনী কাটিল "ভাইরে! ওরা হলো জলের কুমীর। ওদের দাঁতের মধ্যে যার গর্দ্দান খানা গিয়ে পড়েচে, সে কি আর কখন তা' বার করে নিতে পারে? এতো আর তোমার রাঘব বোয়াল নয় যে ফের উগ্‌রে দেবে!"

"এইবারেই আমাদের রূপসী-রাণী ঠাক্‌রুণটীর সিংহাসন টলমল হলো বোধ হয়! যা হোক ভাই, আমার কিন্তু একবারটী ওর রূপখানা কোন রকমে দেখে চক্ষু দুটো সার্থক করে নিতে হবে। শুনেছি নাকি মাগীটা আরমানী বিবি?"

পাল কহিল "দূর্ ছোঁড়া! আরমানী কেন হতে যাবে?—সে যে আদত কাশ্মীরী।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোরে পুষ্প দিলে বলে পুড়িছে অন্তরে
পুড়িয়া মরুক পুষ্প দিব কেন তারে ?

—মহাভারত।

পরিমল মুক্তার মালা জড়ান খোঁপার উপর একটি পাতাশুদ্ধ সাদা গোলাপ পরিয়াছে, গায়ে তার পাতলা গোলাপী বেনারসীর হাতখোলা জ্যাকেট, তাহাও বোম্বাই মুক্তায় খচিত এবং মুক্তার ঝালরগুলি তার নব কিসলয়চিক্কণ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে ভরা মসৃণ বাহুর উপর অতি সুন্দরভাবে দোল খাইতেছিল। কানের হীরা কয়খানা সন্ধ্যা শুকতারার মতন উজ্জ্বল এবং গলায় একাবলী মুক্তার হার তেমনি স্থূল ও সুগোল। গোলাপ ঝাড়ের বুটাকাটা সন্ধ্যাকাশের মতই সমুজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত সাড়ীর আঁচল হালফ্যাসানে হীরার পিনবদ্ধ, হাতে একখানা পালকের পাখা,—এইরকম সাজগোজ করিয়া সে সান্ধ্য আকাশের শোভা দেখিতে ছাদে উঠিয়াছিল,—অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু ডাকিতেছেন। পরিমলের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকল ভূষা তখনই সার্থক হয়, যখন এই সাজান দেহ তার যথার্থ আদরের পাত্রের আদরের স্পর্শ ও প্রশংসার দৃষ্টি লাভ করে।

"কি গো! কি ভাগ্যি আজ যে এমন অসময়ে গরীবের গরীবখানায় রাজামশাইএর পায়ের ধূলো পড়লো? বলি কোন্‌দিকের সূর্য্যি আজ কোন্‌দিক দিয়ে অস্ত গেলেন?"—বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারই দিকে উদ্বিগ্নমুখে অগ্রসর স্বামীর মুখ সে দেখিতে পাইল; এবং তাহার আনন্দোত্তেজনা ও সুখাবেগে স্পন্দিত হৃদয় যেন অকস্মাৎ স্রোতোহত হইয়া থমকিয়া গেল। উদ্যত অধরের সরস হাস্য এবং ব্যগ্র বাহুর সাগ্রহ

আমন্ত্রণ নিরুদ্ধ রাখিয়া সেও উৎসুকনেত্রে উঁহার হাস্তলেশহীন গম্ভীর এবং উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভরসা করিয়া যেন কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না।

নরেশ একবার তাহার দিকে চাহিয়া 'এসো' বলিয়াই নীরবে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গলার স্বরে কোন কিছু অভাবনীয় ঘটনার আভাস পাইয়া পরিমল চমকিয়া উঠিল, শঙ্কিতমুখে উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

নরেশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই পরিমলের দিবানিদ্রা উপভুক্ত বিছানাটার একধারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরিমল নিকটে আসিতেই নিজের পাশে তাহাকে জায়গা দিয়া সন্দেহশঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পরিমল! আজ আমাদের মস্ত বড় পরীক্ষার দিন। তুমি যদি আজ অকপটে আমার সাহায্য করো, তবেই আমি রক্ষা পাই।"

পরিমল কোন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবো বলো?"

নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবেন তিনি যেন তার ভাষাই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাঁহার উৎসাহ ও দৃঢ়তাপূর্ণ চিত্ত অকস্মাৎ যেন এই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পরিমলের অবস্থাও এই সময়টুকুর মধ্যে যেন উঁহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কি শুনিবে সে যে তার কোন আন্দাজই করিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেশ তাঁর বক্তব্য কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"একটী অনাথা মেয়ে সংসারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, তুমি যদি তাকে দয়া করে একটুখানি আশ্রয় দাও।"

বুকে চাপিয়াধরা প্রবল আতঙ্কটা যেন একখণ্ড স্বচ্ছ লঘু শরৎ মেঘের মতই সরিয়া গেল। স্বামীর বিষণ্ণ চিন্তিত মুখের উপর কৌতুকপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে ভর্ৎসনার স্বরে কহিয়া উঠিল, "ও মাগো! কি মানুষ তুমি! আমি বলি কি না জানি হয়েছে!" বলিয়াই স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাঁর গলাটা দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া সুখের আবেগে গলিয়া পড়িয়া বলিল, "তা'বলে অতটা হিংসুটে আমায় তুমি মনে করো না! এতলোকে তোমার বাড়ী আশ্রয় পাচ্চে; আর সে মেয়েমানুষ বলেই আমি বুঝি তাকে রাখতে দিলে হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাবো, এই তুমি মনে করলে? বেশতো রাখ না তাকে এক্ষণি থেকে রাখ না। কোথায় আছে সে?"

নরেশ স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের এবং অজস্র অনুতপ্ত আদরের মধ্যে অপরাধ বিব্রত হইয়া পড়িয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এর সব ভার তোমায় কিন্তু নিজের হাতে এখন থেকে নিতে হবে! আমি না বুঝে এতদিন ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর তার ফলেই আজ ওর এই বিপন্ন দশা। তুমি এবার ওকে সেই দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে, কেমন পরি-রাণি!"

পরিমল নিজের আনন্দ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহল ভরিয়া কি কথা বলিতে গিয়াই যেন কোন্ নূতন পথের চিন্তাধারায় আর একধারে চলিয়া গেল। হঠাৎ সে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "মেয়েটির নাম কি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নরেশ যেন একটুখানি থতমত খাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন "সুষমা তার নাম, সে—

পরিমলের আদরভরা বাহুর বাঁধন শিথিলমৃণ হইয়া তাহার স্বামীর কণ্ঠ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া পড়িল। শুষ্ক ফুলের মধ্য হইতে যেমন করিয়া

কঠিন ফলের গুটি বাঁধিয়া উঠে, তেমন করিয়া তাহার আনন্দ বিকশিত প্রফুল্ল মুখের সমুদয় রেখা যেন সেই মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত কঠোর হইয়া দেখা দিল। সে নরেশের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলিয়া ত্বরিতকণ্ঠে কহিল "আমার বদলে যদি রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে, তাহলে কি আজ আমার কাছে যে কথা বলতে পারলে, সেই কথা তার কাছেও তুমি তুলতে পারতে? নিতান্ত গরীব বলেই না আমায় তুমি তোমার রক্ষিতার সঙ্গে একত্রে বাস কর্ব্বার কথা বলতে দ্বিধা পর্য্যন্ত করলে না।—কিন্তু জেনো, গরীব হলেও আমি ছোট লোকের মেয়ে নই যে একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে এক-বাড়ীতে থাকতে পারবে।"

নরেশ এই অপ্রত্যাশিত ক্ষুব্ধ স্বরের তীব্র তিরস্কারে যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। সুষমার পরিচয় যে ইহারও নিকট কিছুমাত্র গোপন নাই, মায় তাহার নামটা শুদ্ধ—এ খবর তাঁর জানা ছিল না; তাই এই কথার ঘায়ে তাঁর যেন সকল আশাই একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণকাল সুষমা সম্বন্ধে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার অনুতাপ ধিক্কারে নীরব হইয়া থাকিয়া পরে আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি যদি আমায় একটুও ভালবেসে, এতটুকুও শ্রদ্ধা করে থাক পরিমল! তা'হলে নিজের অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমার এই বিপদের দিনে আমার সহায় হও। পরের মুখে অনেক কথাই শুনা যায়, তার মধ্যে অনেক অসত্যও থাকে; আগে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে জেনে শুনে তার বিচার করে তবেই রায় দিতে হয়। সুষমাকে আমি এতটুকু কচি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক রকম মানুষ করেছি। তার জন্ম অপবিত্রা মায়ের গর্ভে; কিন্তু নিজে সে অতি পবিত্র, তাকে একপাশে একটু স্থান

দিলে তোমার বাড়ী নিতান্তই কলঙ্কিত হবে না। যে সব ঝি চাকরানী-দের তোমরা বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাদের সঙ্গে ওর তুলনাও হয় না।”

পরিমল স্বামীর বেদনাহত ও অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একবারটী যেন নিজের মনের মধ্যে একটা ঘোরতর দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া ফেলিয়া ছিল। পরক্ষণেই কিন্তু তাহার সেই সব পুরাণো কথা মনে পড়িয়া গেল। সৎ-শাশুড়ী, বৈমাত্র-ননদ, অন্নদা ঝি সবাই যে এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তাহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীটীর সংবাদ তাহাকে শুনাইয়া দিতে এতটুকুও বিলম্ব করিতে পারে নাই। শাশুড়ী এমন কথাও আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে, “নরেশের তো বিয়েব সাধে বিয়ে করা নয়; নেহাৎ লোক দেখাবার জন্য একটা বউ এনে ঘরে পুরে রাখা। সুষমা ব’লে তার যে বাইজি আছে, তার মতন সুন্দরী নাকি বাংলাদেশে আর জন্মায়নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয় তাই নরেশ এমন কুৎসিত ও দুঃখীর ঘর দেখে বউ এনেছে। সেই তো সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কিনা, তা এই পরিমলকে কোন্ দিন না কোন্ দিন তার বাঁদী হতে না হলেই এখন বাঁচা যায়!”

সেই হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ শর পরিমলের মর্ম্মের মধ্যে যে বেঁধানই ছিল; তাই নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকিয়া সে শান্ত অথচ অবিচলিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল “তোমার এত বাগান, এত বাড়ী, রয়েছে সে সবের অধিকার ত তুমি ওকে দিলেই পারো, শুধু আমায় যে টুকু ভুল করে দিয়ে ফেলেছ সেই টুকু ছাড়া।—ও যদি স্বর্গের দেবীও হয়, তবু আমার কাছে ওর এতটুকুও জায়গা হবে না।”

এবার নরেশের মনও বেজায় গরম হইয়া উঠিল। বিরক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি কথার উপর জোর দিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “কি তার অপরাধ?”

পরিমল দেহ ঋজু ও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্নদৃষ্টি স্বামীর মুখে নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া ধরিল, স্পষ্টস্বরে কহিল, "তার অপরাধ এতই প্রবল যে তাকে দেওয়া ভালবাসা ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব বোধে তুমি আমার মত তুচ্ছকেও তুচ্ছ বোধ করতে পারো নি। কিন্তু সেইখানেই মস্ত বড় ভুল করেছিলে। রাজার মেয়েরও যেমন, ভিখারীর মেয়েরও তেম্‌নি, মন বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বুকের ভিতরে একই রকম ভরা আছে। তুমি যাকে ভালবাস, তাকে আমার পাশে বসে ভালবাসবার সুযোগ আমি তোমায় কিছুতেই দিতে পারবো না। যদি তাকে এ বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব দেবে বলেই স্থির হয়ে থাকে, তা'হলে হুকুম করো আমিই না হয় বাগানে গিয়ে থাকিগে। এক বাড়ীতে ভদ্র কন্যার আর পতিতার মেয়ের থাকা চল্‌বে না।"

নরেশকে একেবারেই স্তম্ভিত বাক্যহীন দেখিয়া নিজের উদ্গত অশ্রু কোন মতে সম্বরণ করিয়া লইয়া রোষক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, "কিম্বা বাগানও যদি তার হাওয়া খাবার জন্যে দরকার পড়ে যায়, কাজ নেই আমায় তা দিয়ে। তার চাইতে দেশের বাড়ীতে নতুন মায়ের কাছে আমায় বরং পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দাও, আর ততক্ষণের জন্যে শুধু তোমার তাঁকে—"

নরেশ একটা সুদীর্ঘতর নিশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "পরিমল! বিপন্ন আশ্রয়ার্থীকে তোমার দয়ার মধ্যেই সঁপে দিতে চেয়েছিলেম, সেটা এমনভাবে নেবে জান্‌লে সে চেষ্টা করতেই আসতেম না। ভাল, তাকে একবারটী নিজের চোখেই দেখ,—ভাল মন্দ লোক তো চোখে দেখেও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ডাকি তাকে?"

পরিমল দু'হাত তুলিয়া দু'চোক ঢাকিয়া মাথা নাড়িল।—"আমার

স্বামীকে আজও যে আমার কাছ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, আমি তার মুখ দেখবো না।"

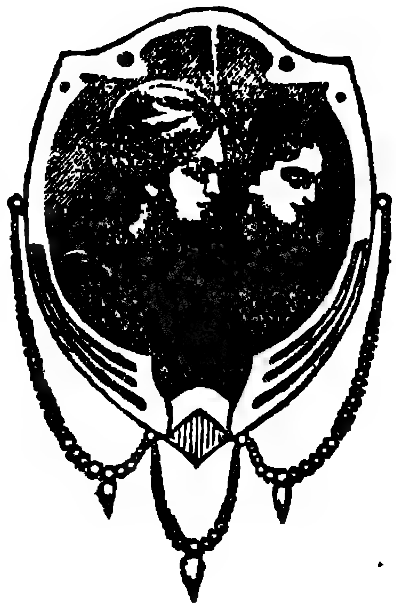

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে
কহিল পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ?

—কথা।

হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় বুঝিবে কি তুমি !
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি।
সাধকে কি সিদ্ধি তরে, ইষ্টদেবে পূজা করে.
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় নাক তার ?
চির সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার।

জান না আমায় আমি জানাতে না চাই।
আমি যেন যুগে যুগে এই সুখ পাই।

৺ইন্দিরা দেবী।

নীচের তলার একটা ঘরে সুষমা একাকিনী মেজের উপর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যেন একগাছি ছিন্ন লতিকার মতনই বসিয়া পড়িয়াছিল। রাজা নরেশচন্দ্রের এই সুবিপুল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদ ভবনে প্রবেশ করিয়াই তার সমস্ত মনটা যেন লজ্জায় অনুতাপে সঙ্কোচে ও ধিক্কারে গুটাইয়া অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ও নিরুপায়তার ভয়ের তাড়নায় সে কানাই সিংয়ের প্রস্তাবিত এই কাজটা করিয়া ফেলিবার পরক্ষণ হইতেই তার মনের মধ্যে কিসের একটা অস্বস্তির ঝড়, তুফান তুলিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত গৃহস্থের সুখনিদ্রার অবসরে তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করণোদ্দেশ্যে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে আসিয়াছে এম্‌নি একটা দ্বিধা ও আতঙ্ক যেন তাহার লোভের মধ্য

দিয়া উঁকি মারিয়া উঠিতেছে বলিয়া তার বোধ হইল। যতক্ষণ নরেশ তাঁর স্ত্রীর সম্মতি আনিতে গিয়াছিলেন, তার মধ্যে একটা অকথ্য লজ্জা ও অত্যন্ত তীব্র সঙ্কোচে সুষমার যেন উঠিল সে ঘর সে বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। ছিছি, ছিছি, কেন সে মরিতে এ বাড়ীর পবিত্রতার মধ্যে—উহাদের দাম্পত্য সুখের মাঝখানে নিজের এই কলঙ্কলাঞ্ছিত পাপছায়া ফেলিতে আসিয়া দাঁড়াইল? সে কি গৃহস্থ ঘরে পা রাখিবার যোগ্য!—

নরেশ আসিয়া সঙ্কোচে মৃদুচরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সুষমার মনের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিমিষেই নিবিয়া গেল। সে মুখ তুলিল না, নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না, কোন প্রশ্ন না করিয়াই যেমন ছিল তেম্‌নি নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। শুধু এতক্ষণের পর একটা প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস ভিতরে ভিতরে তাহার বক্ষকে মথিত ও কণ্ঠকে পীড়িত করিয়া অতি তীব্র বিস্ফোরকের মতই বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বহুক্ষণ এম্‌নি ভাষাশূন্য অসহ্য নীরবতার মধ্য দিয়া নিজেদের বেদনাকে প্রশমিত হইয়া আসিবার অবসর দান করিয়া এবং তারপর নিজের মনের মধ্যের চক্রাকারে মথিত ক্রোধ ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের জ্বালাকে কথঞ্চিৎ দমনে আনিয়া নরেশচন্দ্র যথাসাধ্য সৌম্যভাব অবলম্বনের চেষ্টা পূর্ব্বক বলিলেন "চলো সুষমা! তোমায় এখনকার মতন বেলগাছিয়ার বাগানে নিয়ে যাই।"

সুষমা এই কথাটুকুর মাঝখান দিয়া যেটুকু বা বাকি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়া লইয়া এইবার তার নৈরাশ্য ভয় ও বেদনা বিহ্বল চক্ষু দুটি সুধীরে উঠাইয়া নরেশচন্দ্রের গম্ভীর ও স্থির সঙ্কল্পপূর্ণ দুই চোখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কানাই সিংয়ের দেশেই আমাকে পাঠিয়ে দিন, তার বুড়ি

মা আছে, মেয়েরা বউয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আমি বেশ থাকতে পারবো। আপনার বাগান বাড়ীতে আমি আর যাবো না।" সুষমার কণ্ঠে ভৎর্সনার ভাব প্রকাশ পাইল।

সেকথা কানে না তুলিয়াই নরেশ কহিলেন—"বেদানা! আমার স্ত্রী হয়ত ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজও হয়ত আমি তোমায় ভালবাসি। অথচ এই আমার জন্যই তুমি বিশ্বের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার তরঙ্গে প'ড়ে, হাবুডুবু খেতে খেতে অসহায় অনাদৃত ভেসে ভেসে বেড়াচ্চো, আর আমি নিজেকে নিয়ে গৌরব ও সুখ সম্ভোগ করাচ্চি! না, আর তা হবে না। আজ রাত্রেই তোমায় আমি বিয়ে করবো। বলতে তো কেউ কিছুই বাকি রাখেনি, আরও তাদের যতখুসী নিন্দা করুক না। আমি কারু কথাই আর শুনবো না, তুমি আমার স্ত্রী!"

সুষমা নরেশের কথার ভঙ্গীতে ও তাঁহার দৃঢ় কণ্ঠশব্দে অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সভয়চক্ষে তাঁহার ক্রোধ ও আবেগোত্তেজিত মুখের দিকে বারেক চকিত কটাক্ষ করিল, তারপর তাঁর পায়ের কাছে পড়িয়া আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে বলিল "না- না, সে আমি হ'তে দোব না। আমি এইবার জন্মের মতন চলে যাচ্চি, আর কক্ষনো আমার নামও আপনি শুনতে পাবেন না, এবারকার কথা শুধু ভুলে যাবেন।"—সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

নরেশ তাহার কাছে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, স্থিরকণ্ঠে কহিলেন "তুমি ভুলে যাচ্চো বেদানা! তোমায় কখন ত্যাগ করবো না বলে যে তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম। বিবাহ ভিন্ন অন্ত রকমে তোমায় আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই যে কত কঠিন হয়ে উঠছে সে তুমি দেখচোই তো? অতএব ভালমন্দ যাই হোক এই আমাদের পথ, এর পরিণাম যা হবার হবে—উপায় কি তার?"

সুষমা তখন তাহার বিষাদসমাচ্ছন্ন অশ্রুধৌত মুখখানি উন্নমিত করিল; দুঃখের অশনি প্রহারে ফাটিয়া পড়া অন্তরের ব্যথা চাপিয়া সেই অশ্রু প্রবাহের মধ্যেই অত্যন্ত করুণ একটুখানি হাসিয়া সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আরও একটা উপায় আমার আছে সেটা ভুলে যাবেন না। অপরের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে সেটা আমি নির্ব্বাচন করতে ভরসা করিনি বটে; কিন্তু যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হ'ন, তা'হলে অগত্যাই সেই পথটাকেই আমায় বেছে নিতে হবে। আমি মরবো।"

নিরতিশয় ব্যথা ও লজ্জানুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে তুমি কি করতে বলো? স্রোতের মুখে তোমায় ভাসিয়ে দেব?"

সুষমা তাঁহার গম্ভীর ও শোকাহত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু ও শান্তভাবে জবাব দিল, "সামান্য কিছু টাকা দিন, কানাই সিংয়ের দেশেই আমি যাব।"

নরেশ চলিয়া গেলেন, কিছু পরে আসিয়া দেখিলেন, সুষমা একা নাই, তার সঙ্গে নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নিরঞ্জন একঝলক আনন্দের হাসির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "এ যে আমার আনন্দময়ী—"

সুষমা ত্রস্তে বাধা দিল "আমায় অমন কথা বলবেন না,—আমি আপনার অতি দীন হীনা মেয়ে।"

নরেশ নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত কহিলেন "তোমাদের দুজনে চেনা-শোনা হলো কি করে?"

শুনিয়া হঠাৎ নরেশ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষীণ আলোক রেখার সন্ধান পাইলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন "নিরঞ্জন! যাকে তুমি মা বলে উল্লেখ করতে যাচ্ছিলে, একান্ত অসহায়া জেনে অনেক মন্দলোকে

তার সঙ্গে কুব্যবহার করতেও দ্বিধা করছে না। তারই রক্ষার ভার তুমি যদি নাও, তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমি তোমায় চিনেছি, তুমি আমার চেয়েও এ কার্য্যের বেশী উপযুক্ত। আমার নিজের মধ্যেও একটা লোভের আগুন জ্বলন্ত হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি ওকে 'মা' বলেছ—তুমিই ওকে আমার কাছ থেকেও রক্ষা করতে পারবে। আমি তো ও-চোক নিয়ে প্রথম থেকে ওকে দেখিনি!"

নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তার এ নূতন চাকরী এক মুহূর্ত্তেই স্বীকার করিয়া লইল। তখন স্থির বিজলীর মত চোকদুটী নরেশের সন্তচিন্তাভারবিমুক্ত ঈষৎ প্রসন্নমুখে স্থাপন করিয়া সুষমা কহিল, "কিন্তু কার ভার ওঁকে নিতে হচ্চে, সেটা আমার যাবার আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত যে?"

এই বলিয়া নরেশকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া সে নিজেই নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আমি একজন অতি হীনজীবী পতিতার মেয়ে, বাবা! সমাজে আমার জায়গা নেই বলে, অত্যন্ত ছোট বেলা থেকে রাজাবাহাদুর দয়া করে আমায় একটী স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে লালন পালন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষে যা হয়ে থাকে সেই ধরে বিচার করে, লোকে আমার জন্য ওঁর দেবচরিত্রেও কালি মাখাতে ছাড়ে নি। স্বাধীনভাবে কোন চাকরী নিয়ে থেকে ওঁর দেওয়া আশ্রয় ছাড়লে হয়ত কালে আমার ও ওঁর নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়বে, এই আশা করেছিলুম, হিতে বিপরীত হলো! ভয় পেয়ে আজ এখান অবধি—আমার দুষ্প্রবেশ্য জেনেও জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছিলেম। আমি হয়ত ওঁর সকল সুখের রাহু।—বলিতে বলিতে আকস্মিকোদিত বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া সুষমা চুপ করিয়া দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করাতে তার চোখের জল গোপনেই সাদা পাথরের মেজের কঠিন বক্ষ আর্দ্র করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরঞ্জন সব কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বলিল "মা! সমাজ বন্ধনের মধ্যে জাতি নীতি কুল গোত্র এ সমুদয়ের নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু তার বাইরে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শুধু চাই চরিত্র ও ত্যাগ। তোমার ক্ষুদ্র ইতিহাসে ও-দুটি জিনিষই প্রভূতপরিমাণে দেখতে পেলুম। আমরা মায়ে ছেলেতে যদি কোন সেবাশ্রমে, যদি কোন পুণ্যক্ষেত্রের সন্ন্যাসীপরিচালিত কর্মশালায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করে কাজ নিই, তা হ'লে তোমার মা কি ছিল, সে প্রশ্নও যেমন অনাবশুক হয়ে যাবে এবং তোমার"--

নরেশ গভীর আবেগ ও আনন্দোত্তেজনায় নিরঞ্জনকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিল "ঠিক বলেছ নিরঞ্জন! সুষমার মত মেয়েরা যখন সমাজের জন্য নয়, তখন ওদের জন্য কোন সামাজিক জীবের আশ্রয়ও সুসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথাবার্ত্তা কইবো। ওদের মতন মেয়েদের জন্য একটি সন্ন্যাসিনী পরিচালিত আশ্রম করতে পারার বোধ হয় খুবই দরকার আছে।"

নিরঞ্জন উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এক সময় আমার মনের এটা একটা মস্তবড় কল্পনাই ছিল। মিসনরীরা যেমন পথে কুড়নো (ফাউণ্ডলিং) ছেলে মেয়েদের জন্য আশ্রম করে রাখে, ঠিক তেমনি হিন্দুসমাজ থেকে কেন করা হবে না? যে সব পতিতা নারী, বা পতিতার মেয়ে, সুপথে ফিরতে চায়, তাদের আশ্রয় কোথায়? এই সুষমা-মায়ের মতন নিষ্পাপ হয়েও যারা মায়ের পাপের ফলে এ জন্মটা সমাজের বাইরে, অথচ সৎপথে থেকে দৃঢ় তপস্যায় ক্ষয় করতে সমর্থ, তারা কেন সে সুযোগটুকু পাবে না? বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধারীদের আড্ডা যথার্থ ব্রহ্মমন্দির যে নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই। এদের দ্বারাও কত কাজ যে করিয়ে নেবার আছে। যে কাজ মিসনরী মেয়েরা এবং তাদের

আশ্রিতা পালিতারা করচে, সে সবই এরা পারে; আর সুতোকাটা তাঁতবোনা সেবাশ্রম করে দুস্থের যত্ন সেবা ইত্যাদি আরও কি কিছু কম করবার আছে? তবে কেন এত শক্তি অনর্থক অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে? পথভ্রষ্টের জন্য কি পথ সহজ করে কেউ দেবে না?"

সুষমা দুজনকার পায়ের গোড়াতেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া আনন্দসজলচক্ষু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের কদাকার মুখের দিকে চাহিল গাঢ়স্বরে কহিল "বাবা! আমায় ওই রকম করেই তুমি এইবার সার্থক করে তোল। এখন মনে হচ্চে, তা হলে আমার মতন হতভাগ্য জীবনেরও দরকার ত কোথাও আছে!"

নিরঞ্জনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া সুষমা চলিয়া গেল। একদিক দিয়া অতুল শান্তিতে এবং আর একদিক হইতে একটা তীব্র ব্যথায় নরেশচন্দ্রের প্রাণটা যেন হাহা করিয়া উঠিল। এতদিন পরে সুষমা যে তার প্রকৃত পথের সন্ধান ও সে পথের যথার্থ আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারই আনন্দ,—আর তার সঙ্গেই এতদিনের পর সুষমার সকল সম্বন্ধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার ব্যথা একটু তীক্ষ্ণ হইয়াই মনে বাজিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা দুজনেই যে মস্ত বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া অম্লান ও অপ্রতিহত রহিলেন, ইহার গৌরবও তাঁহার সেই ক্লিষ্ট চিত্তকে কম সান্ত্বনা দিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।
—তীর্থরেণু।

সেদিন নরেশ যখন চলিয়া গেলেন, পরিমলের বোধ হইল স্বামীকে যেন সে সুদূর কালের মতই হারাইয়া ফেলিয়াছে, হয়ত বা চিরকালের জন্যই তাহাদের এই ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, অতঃপর কোন দিনই তাঁহাকে সে আর নিজের কাছে ফিরিয়া পাইবে না। সে নিজের স্বর্ণসূত্র খচিত গোলাপী আঁচল মুখে চাপিয়া ব্যথায় আকুল আচ্ছন্ন হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কম্পিত হইয়া বিদীর্ণপ্রায় অন্তরের মধ্য হইতে তাহার অভিমানপুষ্ট অভিযোগ উঠিয়া আসিল। কান্নায় অধীর হইয়া সে মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দুঃখীর চেয়েও দুঃখী আমি, সে তো তুমি জেনে শুনেই আমায় নিয়ে এসেছ! কিন্তু ভালবাসায় যে একসময়ে আমি আজকের রাজরাণীর চেয়েও ঢের বেশী বড় ছিলুম, সে তো তুমি দেখতে পাওনি। তাই ভেবেছ কতকগুলো সোনাদানা চাপিয়ে দিলেই গরীবের মেয়ের বুঝি বুক ভরিয়ে দেওয়া যায়, না? আমার মতন ক'জন বাপের ভালবাসা পায়? আমার কি স্নেহ ভরা মস্ত লোক ভাই-ই ছিল! আমার মা;—আর তিনি? তাঁর কাছেই কি আমি কম পেয়েছিলুম? দাদার বন্ধু কিন্তু দাদার চাইতেও যেন তাঁর যত্ন আরও বেশীই ছিল। তাঁর মায়ের কথা মনে হলে যে এখনও আমি কান্না চাপতে পারিনি। আমায় তুমি গরীব বলে,

কালো বলে, এত তুচ্ছ ভাববে যদি, তা'হলে কেন আমায় রাণী কর্তে নিয়ে এলে? আমি না হয় সেখানে পড়ে থেকে মরেই যেতুম। আমার মতন পোড়াকপালীর মরণই ভাল ছিল যে। আজ যদি আমি আবার তোমায় হারাই, তা'হলে বেঁচে থেকে আমার হবে কি?

আবার—সে আবার বর্ত্তমান আঘাতের ও নিরুদ্ধবেদনায় ভরা অতীত স্মৃতির স্মরণে অজস্র কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। কিন্তু তার পরই তার মনে হইল, হয়ত এতক্ষণ তার স্বামী তাঁর ভালবাসার জনকে পাশে লইয়া তাহাকে ফেলিয়া কোথায়—কত দূরেই চলিয়া যাইতেছেন। নিজের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং স্বজনত্যক্ত অতীত আবার যেন নিজের ভয়াবহ মূর্ত্তিখানা লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। অমনই সেই প্রচণ্ড অভিমান যেন বন্যাধারায় ভাসিয়া গেল। সে সহসা বিদ্যুৎবেগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে মোটর প্রভৃতি বাড়ীর কোন গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছে না, খিড়কীর সাম্নে শুধু একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। পরিমল ইহা দেখিয়া ঈষৎ আশ্বস্তচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, সহসা নজরে পড়িয়া গেল নীচে সেই ভাড়া গাড়ীর অভিমুখে একটী ক্ষীণাঙ্গী ও সুন্দরী মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহাকে দেখিয়া সে সুষমা বলিয়া মনেও করে নাই, কিন্তু যখন তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া নিরঞ্জনও সেই গাড়ীতে উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তে নরেশ আসিলেন ও নিরঞ্জনের হাতে একটা চিঠির খাম দিয়া বলিলেন "এই চিঠি দেখালেই তারা সমস্ত ঠিকঠাক্ করে দেবে। সুষমা! তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারবে জেনেই নিরঞ্জনকে আমি তোমায় দিলুম। দেখচি ওর মতন বন্ধু আমার আর জগতে কেউ কোথাও নেই।"—তখন সেই নিরাড়ম্বর বেশধারিণী ও বালিকাকৃতি মেয়েটীকে সুষমা জানিয়া পরিমল

অত্যন্তই বিস্মিতা হইল; এবং তারপর তার মনে হইল, রূপই বা তার এমন অসাধারণটা কি?

লোকের রটনা যে কতটাই অবাস্তব হইতে পারে তাই দেখিয়াও সে অবাক হইল। সে যে এতদিন শুনিয়াছে রাজা তাঁর অর্দ্ধেক রাজ-ঐশ্বর্য্য সুষমার চরণেই ঢালিয়া দিয়াছেন। হীরায় তার গা ভর্ত্তি এবং রূপ নাকি তার সেই হীরার চেয়েও উজ্জ্বল! তার যায়গায় এই সিদাসিদে নিরালঙ্কারা সুষমাকে বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। স্বামীর দুঃখিত কণ্ঠ ও অভিমান বাক্যও পরিমলের ঈর্ষাবিদ্ধ অন্তরে এই সুযোগে লজ্জার সূচী বিদ্ধ করিতে ছাড়িল না।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাহার শীতল স্পর্শ এবং চাপা কান্না অনুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কে"?

পরিমল ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া দুইহাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, অশ্রুপরিপ্লুত কাতর স্বরে বলিল, "আমার উপর তুমি নির্দ্দয় হয়ো না। আমি যে সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি!"

নরেশ স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিলেন, তাঁর বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস উঠিল। বলিলেন, "পরিমল! সুষমার কথা তুমি কি ভুলে যেতে পারবে?"

পরিমল মাথা হেলাইয়া জানাইল সে পারিবে। লজ্জায় সঙ্কোচে কথার উত্তর সে দিতে পারিল না।

"সে জন্মের মতই আমার সংস্রব ছাড়িয়ে গেছে, তোমার কল্পনা থেকেও অন্ততঃ তাকে তুমি মুক্তি দিও, আমরা যেমন ছিলুম তেমনই থাকবো।"

নিরঞ্জন সুষমাকে লইয়া নরেশচন্দ্রের বাগানে যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ সে বলিল "ওই বাগানের রাস্তার ধারেই আমি আধমরা হয়ে পড়েছিলুম, রাজাবাহাদুর আমায় ওইখান থেকেই তুলে নিয়ে আসেন। বাগানের দরওয়ানগুলো ঠিক যেন যমদূত!"

সুষমার একথা শুনিয়া কি মনে হইল সেই জানে, সে সহসা বলিয়া উঠিল "দেখুন, বাবা! আমার সেই ছোট্ট বাড়ীটাতে অনেকগুলি দরকারী জিনিষ পত্র আছে, আজ আমরা সেই খানেই যাই চলুন; কাল তখন সব গোছগাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে একেবারেই।"

ভিতরের কথা না জানিয়া নিরঞ্জন সহজেই সম্মত হইল। যেখানে একদিন ভিখারী নিরঞ্জন নরেশের কৃপালাভ করিয়াছিল, সেখানের ভৃত্যবর্গ হয়ত মনিবের অসাক্ষাতে আজও তাহাকে তেমন করিয়া না মানিতেও পারে। নরেশের পত্র থাকিলেও মানুষের প্রকৃতিকে কি হুকুমে রদ করা যায়? তাই সেখানে তাহার কিছু উপদ্রুত হওয়া সম্ভব জানিয়াই নিজের বাড়ীতেই সে ফিরিতে চাহিল। নিরঞ্জন সঙ্গে থাকাতে মনে যথেষ্ট সাহস ছিল।

এখানে আসিয়াই কিন্তু অপ্রত্যাশিত ফললাভে আনন্দে সে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল।—এযে তার সেই ছোট্ট বেলাকার ইষ্ট গুরু সেই সাধুজী! আজিকার বড় দুর্দ্দিনে অযাচিতরূপে আসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবর্ণনীয় আনন্দের আতিশয্যে শিশুর মত চঞ্চল ও উৎফুল্ল হইয়া চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া সুষমা বারবার করিয়া বলিতে লাগিল "ঠাকুর গো! আপনি নিশ্চয়ই ভগবান! আমি যে কায়মনোবাক্যে আপনাকেই ডাকছিলুম, তা আপনি জানলেন কেমন করে?"

সাধু কহিলেন "বেটা! আমি যে তোমায় নিজের দরকারেই খুঁজতে এসেছিরে! রাজাবেটা যদি হুকুম দেয়, তা হলে আমি তোকে আমার 'অশরণালয়ের' সেবাশ্রমের ভারটা দেবার জন্যে সঙ্গে করে অযোধ্যাধামে নিয়ে যাই।—সেখানে দুতিন জন জমিদারের সাহায্যে আর ভিক্ষার ধন

দিয়ে আমি এক মস্ত কাজের ছোট্ট বীজ বপন করেছি। জানিস বেটা! বদরীনারায়ণে গিয়েও তোর কথা আমার মনে জাগ্‌ছিল। পথে এক তোর মত পাঞ্জাবী মেয়ে হাতে পেলুম, তার মা বেটী আমার পা জড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালালো,—বল্লে মেয়েটী যাতে ধর্ম্মপথ পায়। বিস্তর ভেবে ভেবে তোদের কথাই আজ পাঁচ ছ বছর ধরে গেয়ে গেয়ে কিছু টাকার জোগাড় করলাম। এর মধ্যে আরও দুতিনটী ছোট ছোট মেয়ে আমার কথা শুনে তাদের মায়েরা আমায় দিয়ে গেছে। পথের ধারে সদ্য জন্মানো একটাকে কুড়িয়েছি। দুজন বুড়োমানুষের জিম্মায় তাদের রেখে তোকে এই নিতে এসেছি। কি হবে বেটা! গান বাজনা শিখে? হরিকে ডাকবার জন্যে নিজের স্বভাবদত্ত কণ্ঠ যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট! কাজ কর্; জগতে এসেছিস্, জন্ম সার্থক কর্। যে যেমন জন্ম পেয়েছিস বেটা, তাকেই আবার বড় করে নেওয়া যায়। সবাই কিছু সংসারে আর একজনের বউ হবার জন্যে জন্মায়নি। হাঁড়ি কুঁড়ি সাজিয়ে খেলা নাই বা করতে পেলি? ছেলে হয়ে মা না হলেই কি তার মা হওয়া যায় না? যাদের দুঃখের জন্ম, লজ্জার জন্ম, জন্মেই যারা সব হারায়—এমন কি নিজের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত—তাদের মা হবে কি চিরদিনই ওই সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিদেশী মায়েরাই? তোরা দখল করে নেরে বেটা, দেশের ওই অনাদৃত অংশটাকে তোরা নিজের জোরে দখল কর। ক'রে চরিত্রবলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে টেনে আন্। এ একটা কম অভাব নেই ত দেশের!"

ঠিক নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং তাহা শুধু কল্পনা মাত্র নয়, বাস্তবের মূর্ত্তিতে তাহার দেখা পাইয়া সুষমা যে কি নিধিই হাতে পাইল তাহা বলিবার নয়। সে মুখে শুধু পুনঃপুনঃ আনন্দাশ্রুসিক্ত হইতে

হইতে বলিতে লাগিল "উঃ যদি আমি আজ না আসতুম! যদি আমি আজ না আসতুম!"

সেই দুঃসহ ক্ষতির কল্পনামাত্রে সুষমার প্রাণ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ মসীঢালা কালীতনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি
পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।

—কথা।

নিরঞ্জন চলিয়া গেলে পরিমল তার জন্য যে এতখানি শূন্যতা বোধ করিবে তা বোধ করি তার স্বপ্নেও জানা ছিল না। ইদানীং পড়ার দায় না থাকায় সে বেশ প্রসন্নচিত্তেই যখন তখন খুঁজিয়া পাতিয়া তাহার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করিতে আসিত। সেই অবসরে তার ঘরের বিছানার আহারের ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান করাও তার একটা কাজের মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অপ্রিয়দর্শন ভগ্ন দেহমন লোকটীর মধ্যে পরিমল যেন তার পূর্ব্ব স্মৃতির একটুখানি সৌরভ পাইত, তাই তাহার পরে তাহার পূর্ব্ব বিরাগ দিনে দিনেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সুষমা আসিয়া তাহাকে চিলের মতন ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়াতে হয়ত সে তার উপর একটু বেশী করিয়াই চটিত যদি না এর মধ্যে জড়িত থাকিতেন তাহারই স্বামী। নিঃসঙ্গ পরিমলের অবসরকাল ক্ষেপের একটুখানি অবলম্বন নিরঞ্জনকে যে তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে টানিয়া লইয়াই তাহার ঘাড়ের সুষমারূপী প্রেতিনীটা বিদায় হইয়াছে এই কথা মনে করিয়া নিরঞ্জনকে তার এতই শ্রদ্ধা হইল যে সে বলিবার নয়। হাজার বার করিয়াই তার তখন মনে হইল যে, কথায় যে বলে—যাকে রাখো, সেই রাখে—তা বাপু এ ঠিকই!—ভাগ্যে উনি ওটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাই না আজ নিজে বেঁচে গেলেন, অন্ততঃ আমি তো

বাঁচলুমই! ও না থাকলে আর কার ঘাড়ে যেত, আমার ঘাড়ই সে ভাঙ্গতো নিশ্চয়।

যে সময়টায় সে নরেশচন্দ্রের খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য নীচে নামে এবং কোন কোন দিন একবার করিয়া নিরঞ্জনেরও খোঁজটা খবরটা লয়, তেম্‌নি সময় সেদিন নিরঞ্জনের বিজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার নজরে পড়িয়া গেল, একখানা মলাট ছেঁড়া পুরাতন খাতা। এই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার ছত্র কয়েক মাত্র সে এক সময়ে পড়িয়াছিল, যখন সবে মাত্র এর আরম্ভ। এতদিনে না জানি মাষ্টার মশাই-এর ডায়রিখানা কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবরটী জানার অদম্য কৌতূহলে পরিমল সেখানা চুরি করিয়া লইল। নিশ্চয়ই এইবার সে এই ছদ্মবেশীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে! তবে এই যে ডায়রি এ সত্য সত্যই কি ডায়রি—ডায়রি-চ্ছলে লেখা একটা উপন্যাস নয় তো? নরেশের বিশ্বাস নিরঞ্জন একটা ছদ্ম-বেশী বড়লোক। কিন্তু পরিমলের মনে নিরঞ্জন সম্বন্ধে খুবই যে একটা কিছু প্রকাণ্ড ধারণা জমিয়া আছে, তা নয়। তার বিশ্বাস সে একটু লেখাপড়া জানে, বসন্তে স্বাস্থ্যহারা হইয়াছে, হয় গাঁজা খায়, না হয় আধ পাগলা।—সে লোকটা আবার ডায়রি কিসের লিখিবে? তবে গাঁজা-খোর হইলে যে ঔপন্যাসিক হইতে নাই, তেমন তো কোন বিধান দেখা যায় না! অল্প বিদ্যা এবং মস্ত অবসর লাভ বরং এ বিষয়ে কিছু সুযোগই তো ওর কাছে। অনায়াসেই এখানা একখানা উপন্যাস হইতে পারে। বেশ তো না হয় তাদের মাসিক পত্রিকার খোরাক হইবে।

পরিমল এই খাতাখানার প্রথমার্দ্ধ শেষ করিয়া যখন বাকি অংশ পড়িতে আরম্ভ করিল, তার চোখে তখন নিরঞ্জনের তেমন সুন্দর ছাঁদের পরিষ্কার লেখাও যেন কতকগুলা অস্পষ্ট কালির আঁকের মতই,—যেন কতকগুলা পোকার ছানার মতনই কিলিবিলি করিয়া উঠিতেছিল। তার

মাথার মধ্যে যেন একটা গুরু বেদনা, সর্ব্ব শরীরে যেন হাতুড়ি দিয়া পেরেক ঠোকার ব্যথা ;—চোখের দৃষ্টি কখনও ঝাপসা কখনও জ্বালাময়, —আবার কখনও বা প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রুর বন্যায় সম্পূর্ণরূপেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার অতীত জীবনের তিনভাগেরও বেশী তো দুঃখের মধ্য দিয়া অতীত হইয়াছে, কিন্তু এত বড় যন্ত্রণা-ভোগ যেন তাহার সে সব ভয়ানক দিনেও ঘটে নাই। একি অসম্ভব সম্ভব হইয়া আজ তাহাকে দেখা দিল ? একি সত্য ? একি স্বপ্ন নয় ? একি কোন যাদুকরের খেলা হইতে পারে না ?—এও সম্ভব ? এও সম্ভব ?—

সে খাতায় কি ছিল ? এমন কিছুই না ! শুধু একটি দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী মাত্র। সংসারের খাতা হইতে ছিঁড়িয়া পড়া কয়েকখানি হারানো পাতা। সে পাতা ক'খানি এই রকম !—

"জীবনটা যেন এলো মেলো হয়ে পড়েছে। এর গ্রন্থি যেখানটায় ছিল, সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না,—জট পাকিয়ে গেছে কিনা। লোকে আমার কথা জানতে চায়, তাদের কাছে বল্‌বো কি, আমার নিজের কাছেই সবটা যেন খাপ্‌ ছাড়া গোলমেলে ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনেই কি ছাই ছিল কিছু ? আমি যে কোন দেশের লোক, নামটাই বা কি ছিল, অক্ষর পরিচয় আমার কোন দিন হয়েছিল কিনা, এসবই তো ভুলে বসেছিলেম। মনে পড়িলো কবে ? তার বছর দেড়েক বাদে হবে বোধ করি ? আচ্ছা ডাক্তার সাহেবের আশ্রয় আমি ছেড়ে আসি কোন্ সময়টায় ? মনে পড়ে না। কিচ্ছু মনে পড়ে না। হ্যাঁ, ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে যে, তাঁর ওখানে থাকতে থাকতেই আমি একটু একটু বই টই পড়তে পারছিলুম। এক দিন সাহেবের ছোট ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইছি, তাই শুনে মেমসাহেব সাহেবকে ডেকে আনেন। তাঁরা আমার ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করে কি একটা

যেন বই দিলেন, গড় গড় করে পড়ে গেলুম। ভারী খুসী! ছেলেমেয়েরা তো আমায় ঘিরে আনন্দে হাত ধরাধরি করে নাচতেই লেগে গেলো!

তারপর থেকে আমার ভারি খাতির। সাহেবতো তাঁরা নন, সিন্ধুদেশের লোক। চেহারায় আর পোষাকে আমার ওঁদের ইটালিয়ান বলে বোধ হয়েছিল, দুদিন পরে বুঝলুম আমার ভুল। আমার বুদ্ধির দশা ঐ রকমই যে হয়ে পড়েচে। কে বল্‌বে যে এই আমিই একদিন নাকি ডবল অনার নিয়ে বি এ, পাশ করেছিলুম সব্বার ওপোর হয়ে!

হায়রে—"ধন জন মান, পদ্মপত্রে জলের সমান" এযে দেখছি তারও চেয়ে বেশী!—বিদ্যে বুদ্ধি এগুলোতো ভিতরের জিনিষ, সেতো আর লুঠ করে নেওয়া যায় না,—অথচ দেখা যাচ্ছে যে তাও ফুরোয়। আর দেহের রূপ! সে যে কেমন করেই একেবারে হুবাহুব একখানা পোড়া কাঠের মূর্ত্তি নিতে পারে, সে যেদিন প্রথম দেখি, ঐ সিবিল সার্জ্জন মালখানী সাহেবের বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে সীতার হাতের কৌটায় বসান আয়না দিয়ে, সেদিনের কথা,—এইতো দেখছি বেশ মনেই আছে। সেবি যন্ত্রণাই মনের মধ্যে বোধ করেছিলেম! তারপরই বোধ করি আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় ও সেই সময় পাগলামীর ঝোঁকে কেমন করে বেরিয়ে পড়ে পালিয়ে আসি। সেতো মনে নেই! তার জন্যে এখনও আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে সে যদি মানুষের মধ্যের সকল দুর্ব্বলতারই উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে, তা হলেতো আর কথাই থাকে না, সে তো তখন পুরুষোত্তম পদ পায়। আমি যদি সেই জিনিস হতে পারতাম, আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। পারিনি, তাই এই দুর্দ্দশা। সেদিন যে আমিকে আমি চিনতুম, সে আমিকে আর দেখতে পেলুম না। সে আমার যে মৃত্যু হয়েছিল, সে আমার আত্মীয়েরা যে আমায় শ্মশান

ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে গেছে, সে আমি যে আর বেঁচে নেই, শ্রাদ্ধাধিকারী নেই বলে শ্রাদ্ধ না হয় হয়নি ; কিন্তু তার নাম যে মরার হিসাবের সঙ্গে লেখা হয়ে গিয়েছিল ; এ জগতের সঙ্গে যে তার কাজ কারবার চুকে গ্যাছে, সেই সব কথাই ওই আয়নার মধ্যে থেকে এক নিমিষের ভিতরে এই নূতন দেখা আধপোড়া ভীষণ মুখখানা আমায় বলে দিলে, আর চেঁচিয়ে উঠে আমি মূর্চ্ছা গেলুম। আর ওকে দেখিনি—কোন দিনই দেখিনি। দেখলে হয়ত এখনও অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যেতেপারি। কি জানি কেনই আমি ওকে সইতে পারিনে,—একেবারেই সইতে পারিনে। যেন মনে হয় ঐ আমার সেই পুরানো অতীতকে—হারানো অতীতকে—আমার কাছে থেকে ডাকাতী করে কেড়ে নিয়েছে। এখন এ মুখ নিয়ে যদিই আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, আমায় কি তারা তাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত রমেশ বলে আদর করে ডেকে নেয় ? না পাগল বলে পুলিস ডাকে ? এটা আমার জানতে ইচ্ছে করলেও এপর্য্যন্ত পরখ করবার ভরসা আমার হয়নি। লোভ দুএকবার মনে জেগেছিল, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম গা ছমছম করতে লাগলো। আমি যে মরা মানুষ! আগুনজ্বলা চিতা থেকে চুরি করেই না হয় বেঁচে উঠেছি। তা বলে যারা আমায় মরতে দেখেছে তাদের সামনে যাব কেমন করে? ভয়ও হয় লজ্জাও করে। আবার চেহারাখানাও যদি আগের কোন চিহ্ন ধ'রে থাকতো, তাহলেও নয় একটা যাহোক কথা ছিল। যদি কোনও দিন যাই তো সেই ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে করে। কিন্তু তাতেই কি পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হবে ? তা ছাড়া আমি গিয়েই বা করবো কি ? আমার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সে কি আর আজও আমার জন্যে পড়ে আছে ? তা ভিন্ন সংসারে বন্ধন বলতে তো আমার কোথাও কিছুই বাকি নেই সে সব যে চুকিয়ে নিয়েছি। নাঃ দরকার নেই, আর জাল প্রতাপচাঁদের দ্বিতীয় প্রহসনে।

"আচ্ছা মানুষগুলোর আসল অবস্থাটা কি? ভেবে ভেবে তার তো কোন কূল কিনারাই আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেম না। গাছ থেকে না পড়ে সে মানুষের পেটের থেকে জন্মায়; তা ভিন্ন আর সবই তো তার গাছের ফলের মতই অনিশ্চিত। কোন্‌টা হয়ত ফুলের মধ্যেই লয় পাবে, কোনটা অঙ্কুরেই শুকিয়ে যাবে, কেউ তার চেয়ে বড় হয়ে ঝরে পড়বে, আবার কেউবা টেঁকে থেকে পেকে উঠ্‌বে। তা, তাও যে কা'কে কাকে ঠোকরাবে আর কে'বা পড়বে দেবতার নৈবেদ্যে বা রাজভোগে, তারই নাকি কোন ঠিকানা আছে? মানুষ-গুলোও যেন তেম্‌নি এক একটা গাছের ফল, কূলহারা তরঙ্গ, পথ-হারানো পথিক। হাঁ মানুষ ঠিক যেন পথ হারানো পথিকই বটে! কোথায় ওদের বাড়ী ঘর, কোথায় ওদের যাত্রা পথের শেষ—তারতো কোন নিকেশই আমি দেখি না! কেবল ঘুরে ঘুরেই পরিশ্রান্ত। একটা গান অনেকদিন আগে শুনেছিলেম, কি কিসে যেন পড়েছিলেম,

'মন! চল নিজ নিকেতন,
সংসার প্রবাসে, প্রবাসীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণ?'

কিন্তু 'নিজের নিকেতন' কোথায় তার? জন্ম থেকে জন্মান্তর সেতো সেই অনাদি কাল হতেই এমনি করে 'প্রবাসীর বেশে' 'ভ্রমণ' করচে। একি অকারণ? এর উদ্দেশ্য নাকি শেষকালে সেই 'নিজ নিকেতনে' পৌঁছান। কিন্তু ক'জন লোকে আজকে পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারলো আমার যে বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে? আমার তো মনে হচ্চে, আমি বুঝি কোন দিনই তা পারবো না। নিজের এ জন্মের বাড়ীখানাকেই মনে হচ্চে যেন সে কতদূরেরই পথে। যেতে গেলে যেন সে পথ আর কখন ফুরবেই না;—তা' নিজের সেই অসীম অনন্ত পথের শেষ ধারে যে সত্যিকারের বাড়ী আছে, সেখানে আমার পৌঁছে দেবার সাধ্যি কি আর আমার আছে? তা'হলে শুধু এ

জন্মেই নয় চিরজন্মই এমন করে পথে পথে 'প্রবাসে প্রবাসে' ঘুরেই মরতে হবে দেখছি! ওগো! ও, পারের বন্ধু! এই অফুরন্ত পথ কি আমার কোন দিনই শেষ হবে না গো ?

"আচ্ছা সংসারে কি কেউ সুখী হয় ? দু'চারদিনের কথা বলছিনে, অন্ততঃ তার আধখানা জন্ম ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কেউ করিতে কি পেরেছে ? আমি তো মোটেই এটা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।—ধর, ছোট বেলায় সুখ ত বড় মন্দ থাকে না, কিন্তু লোভ তাতেও বাধা দেয়। যা চাই তা পাইনে,—পাওয়ার ইচ্ছার শেষ রাখেননি যে ভগবান! কাজেই সে সুখের পদ্মও যে কাঁটার উপর ফুটে থাকে। তারপর বিদ্যারম্ভ হলেই সুখের ঘরে শূন্যি বস্‌লো। ক, খ শেষ হতে না হতেই শতকে নাম্‌তা, সঙ্গে সঙ্গে এ, বি, সি, ডি'র ঠ্যালা। তার পর অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক্ রাখাই গোল হয়ে পড়ে। তারপর এই মহাসমরে জয়ী হয়ে উঠ্‌তে পারলে,—ভগবান করুন আমার মতন কারু আজন্মের শ্রম এমন করে যেন ব্যর্থ না হয়; কিন্তু খুবই সুখী হতেও আমি বেশী লোককে দেখেছি তাও তো আমার মনে পড়ে না। শুধু কোটীর মধ্যে দু'একজন, যাঁরা পরের জন্য নিজেকে ছেড়ে দেন, তাঁরাই বোধ করি যথার্থ সুখী হতে পারেন—অন্ততঃ হওয়া তো উচিত।—তার মধ্যেও রাজা নরেশ কিন্তু সুখী নন; তা আমি বেশ বুঝতে পেরিছি। ওঁর সব হাসি খুসীই মুখের, মনের মধ্যে অশ্রুর নির্ঝর কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে। কেন ? সে অবশ্য আমার জানা নেই; কিন্তু যা আমার মনে হলো সেইটুকুই আমি আমার ছেঁড়া খাতায় লিখে রাখলুম।

"আচ্ছা রাণী মা—আমার যিনি ছাত্রী, তাঁকে আমার কি মনে হয় ? তিনি সুখী না অসুখী ? না; ওসব মেয়েরা সুখী বেশী না হলেও প্রায় অসুখী হতে পারে না।—মন ওদের ক্রুর নয়, নিষ্ঠুর নয়,

খুব স্বার্থপরও নয়; কিন্তু তবু একটা তফাৎ আছে। সেটা কি, সে যিনি তৈরি করেছেন তিনিই জানেন,—তার বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়ত হেরে যাবো, তবু একটা কিছু যে প্রভেদ আছে তা' স্বীকার করতেই হবে।—তিনি ঠিক রাজা নরেশ নন। এ জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ ডোবেও না, ওঠেও না, ভাঙেও না এবং নূতন করে কিছু গড়েও না। স্থিতিস্থাপক ভাবে এরা একরকম কাটিয়ে যায় ভাল। ঝড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখিবার এদের শক্ত ডানা আছে।—কিন্তু এঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে কেন? সর্ব্বান্তঃকরণেই আমি আশীর্ব্বাদ করি ভগবান ওঁকে রাজরাণী করেই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন না, ওঁর সুখ যেন স্থায়ী হয়।

"সুখদার কথা মনে হ'তে আবার অনেক কথাই যেন মনে পড়ে গেল। সে সব পুরানো গাওয়া গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে আছে, তারা যেন সুরবাহারের সুরের ঝঙ্কার উঠ্‌তেই আপনি এসে ধরা দিলে! সুখদার কথা আরও যে আমার বলবার আছে। তাকে কোথা থেকে, আর কেমন করে পেলেম সে কথাতো এখনও বলা হয়নি, আবার হারাতেও যে বেশী সময় লাগিনি; সেটুকুওতো বাকী রাখা চলবে না। সবটুকুই আমার মনের ভিতর একবার ভাল করে গুছিয়ে নিই। তারপর? তারপর এ খাতাখানা আর একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই ভোরের আলো লাগা ঘুমন্ত গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসবো তখন। চাই কি, সেই অবসরে আর একবার আমার সেই "আনন্দময়ী মেয়েটীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু! এলেম কোথায়!
বরষ গত হ'ল, জীবন বহে গেল,
কখন কি যে হ'ল জানিনে হায়!
আসিনু কোথা হ'তে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভেসেছি কালস্রোতে তৃণের প্রায়।
মৃত্যুসিন্ধুপানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন,
জীবন অবহেলে, আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়।

—অজ্ঞাত

কালীপদর বাড়ী যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যার বড় দেরি নেই। ওযে অত গরীব ছিল তা আমি কোন দিন জান্তে পারিনি। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙ্গে বোধ করি কোথায় চলে গেছে, আর একখানা বাতাসে ঢক্ ঢক্ শব্দ করচে। বাড়ীখানা এক সময়ে যে গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় লোকেরই বাড়ী ছিল, সে আজও তার বিরাট বপু দেখেই বেশ বোঝা যায়। হলে হবে কি, আজ যে তার এ গাঁয়ে সবার চাইতেই দশা মন্দ, সেও তো আমি একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেম।

"উঠানে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে একটী কিশোরী মেয়ে তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটুকু গলায় জড়িয়ে প্রণাম করছিল, আমায় দেখতে পেয়েই সেই আঁচল সে গায়ে টেনে দিলে, মুখের চেহারা থেকেই জান্তে পারলুম যে সে আমার কালীপদর বোন সুখদা।

"সুখদার মা যত পারলেন কাঁদলেন, জন্মের মতন দ্বীপান্তরিত ছেলের

এসে রেখে দিয়েই চলে গেলে, আমি বল্লুম, 'সুখদাকে দেখতে অনেকটাই কথা উল্লেখ করে তার আচরণের নিন্দা করলেন এবং যারা তাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে তার চেয়েও অধিকতর পাপে পাপী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যেও তিনি খুবই আশীর্ব্বাদ করতে পেরে উঠলেন না। তার পর অনেক বিলম্বে আর সব কথা চুকিয়ে দিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের কথা তুল্লেন।"

'সংসার তো' আর চলে না বাবা, যা কিছু ছিল পদ'র মোকদ্দমায় ধরে দিলাম, আইবুড় মেয়ে ঘাড়ে, কি করি এখন?'

"আমি আগে হতেই ভাবছিলাম যে কেমন করে ওকথাটা আমি বলবো? অবশ্য পদ'র বোনকে চোখে দেখে বলবার ভাবনাটা আমার একটুখানি পরেই কমে গেছলো। কারণ কুৎসিত না হলেও সুখদাকে দেখতে এতই সাধারণ যে, সে দেখেই যে আমি ঘুরে পড়িনি, এটা অন্ততঃ তার মা বিশ্বাস করতে পারবেন। এখন আরও একটু সুযোগ পেয়ে নিঃসঙ্কোচেই বলে ফেল্লুম, "তার জন্যে ভাববেন না, কালীপদ যাবার আগে তার ভার আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমিও তার কাছ থেকে নিয়েছি।"

"পদ'র মা কেমন একটু সন্দেহের সঙ্গেই আমার মাথা হ'তে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা কইলেন। একটু কুণ্ঠিতভাবে বল্লেন, "তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে? এতগুলো পাশ করেছ, অত সুন্দর তুমি, পদ'র মুখে শুনেছিলাম, তোমার বাপ ছিলেন জেলার হাকিম। তুমি কি আমার মতন দুঃখীর মেয়েকে—"

"আমি হাসি চেপে রেখে জবাব দিলুম—'পদ আমায় তার ভার দিয়েছে, বিয়ে যার সঙ্গে হয় হবে, সেতো এক্ষুণিই হচ্চে না। তবে ভাল পাত্র আর কোথাও না পান তো আমাকেই তখন দেবেন, আমারও তাতে কোন আপত্তি নেই।

"তার পর সুখদা মায়ের হুকুম মতন আমার জন্যে জলখাবার নিয়ে কালীপদর মতন, তাই আমার আরও আপত্তি নেই।'

"সুখদার মা এবার যে কান্নাটা কাঁদলেন তারমধ্যে আধখানা দুঃখের এবং আধখানা সুখের। সেই ছেলেই তো তাঁকে মহাদেবের মতন জামাই দিয়ে গিয়েছে!—এই কথাটা এ ক্রন্দনের মধ্যে প্রধান হয়ে রৈলো।

"মাস পাঁচেক পরে পড়াশোনা সাঙ্গ করে ঘরে এসে বসলুম।"

"ওইখানকারই সবজজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বছর পার হয় চলে আসছিল। মেয়ে আমি দেখেছি, চারুমতীকে দেখতে বোধ করি ভালই হবে, যা একটু বেশী মোটা। তা ধনীর দুলালীরা ওরকম হবেন বই কি! গণে পণে, অলঙ্কার, বস্ত্রে, এবং আসবাবপত্রে জজবাবু হাজার সাতেক টাকা মেয়ের প্রতি খরচ করবেন একথাও নাকি ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ী এসে বস্‌তেই তিনি লোক দিয়ে পাকা দেখার দিন ঠিক করে বলে পাঠালেন।

"মা খুব খুসী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হরিষে বিষাদ হলো। মাকে সুখদার কথা ভেঙ্গে বলে জানালুম যে এ বিয়ে করা চলে না। তাদের আমি কথা দিয়েছি। মার মনে যে আঘাত লাগলো সে আমি বুঝেছিলেম। মা আমার এক সন্তানের জননী, কুটুম্বিতার সাধ একটা নারীজন্মের নাকি ঈপ্সিত। যাই হোক তবু আমার কথা বজায় রাখবার জন্যে তাঁর ধনী কুটুম্বের সাধ তিনি ছেড়েই দিলেন।

জজবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে বল্লেন, 'জানো তুমি, তোমার মীর নামে আমি 'ব্রিচ অফ্ কণ্ট্রাক্টের কেস' করতে পারি।'

"তা' অবশ্য আমি জান্‌তাম না। আর যতই কিছু পড়িনা কেন, আইনতো আর পড়িনি, জান্‌বো কেমন করে? একটু ভেকা হয়ে রইলুম। তিনি তখন আমায় কাবু দেখে অনেক কথাই বল্লেন এবং তক্ষুণি গালি ফিরিয়ে নিয়ে আমায় 'আশীর্ব্বাদ' করে যেতেও রাজী আছেন, তাও

জানিয়ে দিতে দেরী করলেন না। ততক্ষণে আমার জড়তা কাটলো আমি বল্লেম, 'আমি আর একজনকে কথা দিয়েছি; তারা গরীব অনন্যোপায়, তাদের বঞ্চনা করলে ঈশ্বরের দরবারে আমি দোষী বেশী হবো। আপনার ভাবনা কিসের?'

"কথাটা খোসামোদেরই ছাঁচে ঢালা। তাতেই বাবুটীর রাগ বাড়িলেও মাত্রাটা কিছু যে কম থাকলো সে বোধ করি উহারই জন্য। তিনি রুষ্ট পরিহাসে রূঢ় প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কাঁর মেয়ে শুনি'?

"আমি বিনীতবচনে জবাব দিলাম, 'তার বাপ ছিলেন কালেক্টরির সেরেস্তাদার, একমাত্র ভাইএর রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে, বুড় মা ছাড়া অপর কেউ নেই।'

"জজবাবু যেন আঁৎকে উঠেই উঠে দাঁড়ালেন। রাজদ্রোহের নামেই বোধ করি তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়ে থাকবে! এবার স্পষ্ট পরিহাসেই বল্লেন, 'তাহলে কুটুম্ব নির্ব্বাচনটা করেছ ভাল! যাহোক সময় থাকতে খবরটা পেয়ে ভালই হলো, এনার্কিষ্টের দলে মেয়ে দিয়ে কি শেষে ধনে প্রাণে মারা যেতাম।'

"মার অনুমতি নিয়ে কালীপদর মা বোনকে মার আশ্রয়ে এনে দিলাম। ভাবী পুত্রবধূর মুখ দেখে মা যে আমার খুব উল্লসিত হয়ে উঠেননি, সেতো আমি বুঝতেই পেরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের মাতাপুত্রে কোন আলোচনাই আমরা হ'তে দিইনি। মন তার কল্পনার স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাইবে বইকি! নিজের ছেলের মস্ত নামওলা শ্বশুর, আর সুন্দরী বউ কোন্ মা কবে চায়নি? অথচ কর্ত্তব্যের খাতিরে কতকিই না করতে হয়। ক'জনের মাই বা ভরাবুকে বউ ঘরে তুলতে পেরেছেন! সয়ে যাওয়া দরকার,—চুপ করে সবই সয়ে যাওয়া,—যা পাই তাকেই যথাসাধ্য ভাল মনে করা – এই টুকুই যে মস্ত বড় দরকার। ঐটুকু না পারলেই যে মানুষ একেবারে গেল।"

"সুখদারা রয়ে গেল, আমি চাকরীর জন্য খোঁজ খবর করে বেড়াচ্চি আরও ছুটো একটা পাশ টাস দেবারও ইচ্ছে আছে, বিয়ের জন্য সুখদার মা ছাড়া আর কারু যে বিশেষ কোন ত্বরা আছে তারতো কোন লক্ষণই দেখিনে। আমার হ্যাঁ, তা আমার যে একেবারেই ছিলনা, তাও বলতে পারিনে, আবার ছিলই যে তাও বলবার ভরসা আমার নেই। বিয়ে জিনিষটা সম্বন্ধে খুব বেশী তলিয়ে আমি কোন দিনই ভাবিনি। গোটা কয়েক পাশ করার সঙ্গে ও'ও যেন একটা দায় চোকান। কিন্তু সুখদাকে আমার ভালই লাগছিল। ভালবাসা একে বলতে হয় বলো, আরতো কখনও ভালবাসিনি, কাজেই ও নিয়ে তর্ক আমি কর্‌তে পারবো না,—তবে ভালবাসার বর্ণনা যেখানে যত পড়েছি, তাদের সঙ্গে এ ভালবাসার সম্পর্কটা বড্ড বেশীই অল্প। সুখদা থাকে মার অন্তঃপুরে আমি থাকি হয় সদর বাড়ীতে না হয়ত কলকাতায়। বাড়ীর মধ্যে গেলে কখন কখন সুখদাকে এক আধবার দেখতে পাই। একটু গম্ভীর গম্ভীর চালে সে হয়ত মায়েদের দুজনের পূজোর যোগাড় করছে, না হয়ত পান সাজবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে, মধ্যে মধ্যে পড়াতে বসে মা তাকে 'বোকামেয়ে' বলে অনুরাগ করচেন, তা' শুনতে পেয়ে হাসি চেপে আমি বাইরে পালিয়ে এসে হেসে ফেলেছি। আহা, মা আমার ওপর যা খুসী হচ্চেন, 'গাধা পিটে ঘোড়া বানানো' মুখের কথাটীতো নয়! সুখদার মেধা জিনিষটা বড্ডই নাকি কম! অন্ততঃ মার ত সেই রকমই বিশ্বাস!

"বেশী দিন গেল না। বাবার চাকরী, তাঁর অসময়ে মৃত্যুর সুপারিসে আমি নাকি পেতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছা হলোনা সেটাকে কাজে লাগাতে। তা'ভিন্ন সেই সবজজবাবু নাকি আমার সম্বন্ধে সরকারের কান ভারী করে রেখেছেন এম্‌নি একটা গুজবও শোনা গেল। আমি নিজের টাকা দিয়ে একটা আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধের দোকান খুলে বস্‌লেম। দেশে এক

বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন—মকরধ্বজে সুরকির গুঁড়ো মেশাতে না জানায়, তাঁর কিছুমাত্র পশার ছিল না। তাঁকে দিয়ে খাঁটি মকরধ্বজ তৈরিটা শিখে নেবার চেষ্টা করতে লেগে পড়া গেল। তাঁকে আমার সহায় করে কস্তুরী ভৈরব বা মহামৃত্যুঞ্জয় রসে কস্তুরীর বদলে আদা বাটা বন্ধ করে দেশের লোক যাতে খাঁটি জিনিষটা পায় আর বিলিতি ওষুধের মতন নিঃসঙ্কোচে মারাত্মক রোগীকে খাওয়াতে পারে, তারই জন্যে উঠে পড়ে লাগবো মনে করেছিলেম। তা কপালে তো দেশের সেবা করবার পুণ্য সঞ্চিত করা ছিলনা হবে কি করে?

"আমার কবিরাজখানায় সত্যকার মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম—করাতের গুঁড়ো নয়,—নিখুঁত নেপালী কস্তুরী এবং যত রকম গাছ গাছড়া পাওয়া সম্ভব ছিল, ক্রমে ক্রমে যোগাড় করে তুল্‌ছি, এমন সময় এমন মারাত্মক হয়ে আমাদের দেশে বসন্ত মড়ক দেখা দিলে যে তাঁর কাছে আসল নকল সব রকমের কস্তুরী ভৈরব বা মৃত্যুঞ্জয় রস ভয় পেয়ে পালিয়ে রইলো। হরিনাম সহজে তো কেউ নেয় না। তা একদিনের মধ্যে অমনি পঁচিশবারই হয়ত ঐ নাম গানটা কানে শোনা তো যেতই, মুখেও বলতে হয়েছে বই কি পাড়া পড়্‌সীর খাতিরে। মা আমার জন্যে ভয় করলেও নিজে নির্ভয়ে পড়সীর সেবায় ছুটে যেতেন; আমায় এঁটে উঠতে না পেরে কপাল চাপড়ে খুন হতেন, কিন্তু তবু জোর ক'রে বারণ করতেন না, কেঁদে বল্‌তেন 'ও নিজের কাজ করে রাখচে, বারণ আমি করবো কি করে? বিপদতারণ তো আছেন, তাঁকেই প্রাণপণে ডাকচি।'

"প্রথমে এ বাড়ীতে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগলো সুখদার মাকে। তাঁর সেবা আমরা তিন জনেই কর্‌ছিলুম, কিন্তু দুজনেই আমরা একদিনের আড়া আড়িতে দুজনকারই মাকে হারিয়ে ফেল্লেম। সুখদা মেয়ে মানুষ সে লুটোলুটি করে তার হারানো জিনিষের জন্য চেঁচিয়ে কেঁদে শোক প্রকাশ করলে, কিন্তু বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি বলে আমার কত বড় ক্ষতি

আমায় শুধু নিঃশব্দ চোখের জল দিয়েই সাঙ্গ করে নিতে হলো। তার উপর যে মুখের চেয়ে জগতে আমার আর কিছুই সুন্দর ও প্রিয় ছিল না, সেই সবচেয়ে আদরের মুখই আমার নিজের হাতে—ভাবতে গেলে সমস্ত মন যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। পেরেছিলুমও তো!

"সুখদার জন্যেই ভাব্‌ছিলুম যে বাড়ী ছেড়ে দুজনে কোথাও পালাব নাকি? এমন সময় আমার পালাবার শক্তি হরণ করে আমার সর্ব্বশরীর ব্যেপে বসন্তর গুটি দেখা দিল। সে কি যন্ত্রণা! উঃ সে কি যন্ত্রণা! বোধ করি শর শয্যা পেতে শুলেও তেমন করে সর্ব্বশরীরে তার ফলাগুলো বেঁধে না। হাজার হাজার ছুঁচ দিয়ে যদি সর্ব্বশরীরের মাংসের মধ্যে ফোঁড় তোলা যায় তাতেও কি অত বেশী যন্ত্রণা দিতে পারে? উপকথার রাজার যেমন চোখে শুদ্ধ ছুঁচ বেঁধা ছিল আমার চোখেও যেন তাই হলো। বিশেষ করে ডান চোখটায়। রোগের খেয়ালে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে কেবলই মরা মাকে আকুল হয়ে ডেকেছি আর সঙ্গে সঙ্গেই কার অশ্রুজলে ভেজা কাতর স্বর কানে গেছে, মা, মা, মা শেতলা! ভাল করে দাও মা! মা, মা, মা, মা, ভাল করে দাও মা!'

"যতক্ষণ জ্ঞান ছিল সুখদাকেই অনুভব করেছিলুম, দেখবার তো চোখ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাকে মিনতি করে বলেও ছিলুম 'পালিয়ে যাও সুখদা! কেন অনর্থক প্রাণ দেবে, আমি তো গিয়েইছি।'

সে কেঁদে উঠে বলেছিল 'এক সঙ্গেই যাই চলো, একলা আমি দাঁড়াবো কোথায়?'

"এই প্রথম আর শেষ কথা আমাকে সে বলেছিল। এর পরের কোন কথাই আমার আর মনে নেই। আমার যখন জ্ঞান হলো তখন আমার সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই মনে নেই কত দিনে কত অল্পে অল্পে আমি আমার সেই মরণ শয্যা থেকে বেঁচে উঠেছিলুম?

"হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারদের কাছে পরে শুনেছি, ডাক্তার যে দিন বজরা করে আস্‌তে আস্‌তে জ্বলন্ত চিতা থেকে আমায় মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে আমায় জীয়ন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন, তার পর থেকে প্রায় ছয় মাস পরে আমার গায়ের ঘা শুকিয়ে আমার বাঁচবার আশা দেখা দেয়। এতকাল ধরে হাঁস-পাতালের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পড়ে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছি। প্রাণ, জিনিসটা তো কঠিন বড় কম নয়! আচ্ছা এই যে আমি মরে গিয়েও বেঁচে উঠলুম, এর পর থেকে কি আমার পুনর্জ্জন্ম হলো না? আমি কি আর সেই আগের আমিই আছি? মরে যে গিয়েছিলুম, তা ত বুঝতেই পারা যাচ্চে। পোড়াতে যারা এনেছিল' তারা আমার নিকট বন্ধু কেউ যে নয়, তা চিতায় তুলে দিয়ে প্রস্থান করার প্রমাণও হচ্ছে। কিন্তু কি ভয়ানক আয়ুর জোর আমার! আর অমন নির্জ্জন 'শ্মশান' ঘাটেও কিনা অত বড় 'বান্ধব' জুটে গেল! সেই গলা পচা বসন্তের রোগী তুলে এনে, একবেলার পথ বয়ে এনে এই যে ছ মাস ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচালেন এ কি বড় সহজ কথা! আমার প্রাণটাকে যদি একটুও মায়া করবার দরকার থাক্‌তো, তা'হলে তাঁকে আমার রোজ সকালে উঠে ফুল চন্দনে পূজা করাই উচিৎ ছিল, কিন্তু তা না থাক্‌লেও তাঁর দয়ার যে শেষ হয় না তা আমায় স্বীকার তো করতেই হবে। তাঁর পায়ের তলায় পড়েই এই নূতন জন্মটাকে আমার ক্ষয় করে যাওয়াই উচিত ছিল বই কি! কিন্তু তখন কি আর মাথার কোন ঠিক আছে? কে আমি কি করচি, কোথায় যাব—সবই যে ভুল হয়ে গেছলো। ছ মাসের পর প্রাণের আশা! তারও পর পাঁচ ছয় মাস প্রায় পাগলামীর বিকারে কেটে যাবে। ভাল করে উঠতে বসতেও পেরেছি নাকি ন'মাস দশমাস পরে। সবশুদ্ধ বৎসর দেড়েক আপনা ভোলা হয়ে ছিলুম, অর্থাৎ জীবধর্ম্ম ছাড়া মানুষের ধর্ম্ম বড় কিছুই আমার মধ্যে ছিল না। তবে নিরুপদ্রব

বলে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে আমায় ভগবান আমার নিজের হাঁস-পাতালেরই একপ্রান্তে ঠাঁই দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কপালে যে বিস্তর বিড়ম্বনা লেখা আছে হবে কি,—মনুষ্যত্ব ফিরে আসতে না আসতে এই মুখের ছবি আমায় পাগল করে এবার পথেই ঠেলে বার করে দিলে।

"তার পরের কথা আরও যেন খেইহারা, খাপছাড়া। আসল কথা এই যে, তখন তো আর আমার কথা বলবার জন্ম ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডার বা চাকর বাকর কেউ সাক্ষী হয়ে বসেছিল না। কোথায় কোথায় গেলুম, কবে যেন একবার ভাল হয়ে কোনখানে চাকরী করি! শীতকালটা থাকি ভাল, আবার নাকি পাগলামী ঘাড়ে চাপে, তারা তাইতে তাড়িয়ে দেয়। এম্নি কি কি ঘটেছিল, ঠিক ঠিক মনে না থাকলেও একটু একটু স্মরণে আসে। শেষে যেখানে চাকরী করি তারাই আমায় পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয় বুঝি। তা সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি আর পাগল হইনি, তবে নূতন ক'রে জ্বরে পড়ে এমন দশা হলো যে আর খেটে খাবার শক্তিটুকুও ছিল না। দু'চার দিন ভিক্ষে করে কিছু কিছু পেটে দিই, দু'চার দিন না খেয়েই কাটে, তার পর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এই যে রাজা আমায় আমার আগের জন্মের মতনই মান দিচ্ছেন, এর কি আমি একটুখানিও যোগ্য?

"আচ্ছা তা'হলে মানুষের সব চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যটা কিসে? সব হারানো, না জ্ঞান হারানো? বোধ করি জ্ঞান হারানোর মতন পাপের ভোগ আর কিছুতেই নয়। সবই তো আমার এই জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞানই যদি না রইলো তা'হলে আমার "সব"কে যে আমি হারিয়েছি, তাইবা আমি জানতে পারলুম কই? দুঃখ জিনিষটা যে সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য তাও তো নয়। দুঃখকেও ভোগ করতে একটা সুখ আছে। আমার যে মা আমার ইহজন্মের আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তাঁর বিয়োগ দুঃখকে যদি আমার মন নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দেয়, তা'হলে

আমার পুত্র জন্ম সার্থক হবে কোথা দিয়ে? না না থাক্,—হে ভগবান! আমার এই অসীম দুঃখের পর্ব্বত তুমি ভেঙ্গে দিও না। যদি কেউ দুঃখের মধ্যে বিস্মৃতির কামনা করে, জেনো সে ভুক্তভোগী নয় বলেই তা করতে পেরেচে। আমার দুঃখ! আমার ব্যথা! আমার মনে তুমি পদ্মের মৃণাল হয়ে ওঠো, গোলাপের কাঁটা হয়ে থাকো,—তোমায় যেন আর ভুলি না। কিন্তু এই দুঃখকে বরণ করে নিতে আমি শিখলুম কোথা থেকে বলো দেখি? সেও একটি দুঃখী মেয়েরই কাছে। সে আমার মেয়ে হয়েছে। কিন্তু তাকে আমি মোটে চিনিনে। নাইবা চিনলুম? এ ভবের হাটে কেইবা কা'কে চিনচে? যার সঙ্গে যখন মেলা যায়। গঙ্গার ধারে গাছ তলায় ভোরের পাখীর মতন সে একটি আনন্দের গান গাইছিল। দুঃখ থেকেও যে আনন্দের রস ছড়িয়ে পড়ে, আর তা অঁাজলা ভরে পান করা যায়, তা সেই দিনেই বুঝে নিয়েছি। নাঃ আর যা' হই পাগল আর হবো না। এইটেই দেখছি বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

"একটা জায়গায় বড্ডই আমার খট্‌কা লাগে। সুখদার মুখ যেন এ বাড়ীর রাণীর মুখে কে এনে বসিয়ে দিয়েছে! তাঁর গলার শব্দও তারই চুরি করা!—এ' কেমন করে হলো? আচ্ছা সুখদা মরে গিয়েছে বলে যে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটাই কি ঠিক? কিসে জানলুম? কেউ কি আমায় বলেছিল? কিন্তু বলবেই বা আমায় কে? আমার পুরণো জগৎ থেকে কেউ তো আমার এই নূতন জগতে দেখা দিতে আসেনি। তা'হলে সে কি শুধু আমার মনেরই কল্পনা? তা'হলে কি আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্যে আমি এমন করেই অবহেলা করলুম? সুখদার তা'হলে কি হলো?" সে তো কম দিনও নয়। চার বৎসর। এই চার বৎসর ধরে নিঃসহায়া সুখদাকে কে দেখলে? খবর নেবো,—কিন্তু কেমন করে? আমি যে মরে গেছি। মরা মানুষের চিঠি পেলে জাল বলেই লোকে উড়িয়ে দেবে। নিজে যাব? বিশ্বাস করবে কেউ?

আবার হয়তো পাগলা গারদে ভর্ত্তি হবো। বাড়ী ঘর টাকাকড়ি ছিল তো সবই,—তা কি তার থাকতে পেয়েছে, না আমার জ্ঞাতিরাই দখল করলে? যদি জান্‌তে পারতুম আমার সুখদা এই রাণী পরিমলের মতনই কোন দয়ালু স্বামীর হাতে পড়ে সুখে আছে, আমি বাঁচতুম যে তা'হলে। আমি যে তার ভার নিইছিলুম।

"——কাল সংবাদ পত্রে দেখলুম, যুদ্ধ জয়ের জন্য রাজনৈতিক অনেক অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হচ্চে! আহা আমার কালীপদ যদি আবার ফিরে আসে!—কিন্তু তাকেই বা সুখদার কথা আমি কি বল্‌বো?"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ!
হৃদয় দিব তারি সনে!

—কথা।

নরেশ নিজের পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাবিতেছিলেন তিনি সুষমারই কথা। সাধুজী ও নিরঞ্জনের সঙ্গে সুষমা অযোধ্যা যাইতেছে। সেখানে সাধুজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন তাহাই সুষমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থল। নরেশ অনেকখানি হাঁপ ছাড়িলেন। ঐ দুজন লোককে তিনি একার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত শুদ্ধচিত্ত বলিয়াই জানেন। মনে মনে তাঁদের কার্য্যের সফলতার কামনা করিলেন, মনে মনে সুষমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এজন্মটা তোমার এই রকম করেই কাটিয়ে নাও, এবার যেন নিরাপদ হও, শান্তি পাও।"

উহাদের আরব্ধ কর্ম্মের জন্য সাধুজী তাঁহার নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন। তিনি একখানা চেকবই টানিয়া লইয়া দশ হাজার টাকা সই করিলেন, টাকাটা সমিতির ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া কথা কহিলে নরেশ চমকিয়া উঠিলেন, অশ্রু পরিপ্লুত এবং কি ভাঙ্গিয়া পড়া সে কণ্ঠস্বর।

"আমায় একবার সঙ্গে করে সুষমার বাড়ী নিয়ে যাবে? তার কাছেও একটু ক্ষমা চেয়ে আসবো,—আর—আর—যাঁকে—যাঁকে না চিনে—না জেনে—"

"পরিমল! কি বল্‌চো তুমি? তুমি সুষমার বাড়ী যাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতে?"

পরিমল রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "শুধু তার কাছেইত নয়; তার চেয়েও বেশী অপরাধী আমি যাঁর কাছে তাঁর পায়ের ধূলো না নিয়ে এলে আমি যে আর স্থির হ'তে পারছিনে।" —পরিমল সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশ চৌকি হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িলেন—"পরিমল! পরিমল! কার কথা তুমি বল্‌চো? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনে!"

ক্রন্দনবিবশা পরিমল একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তুমি কি করে বুঝ্‌তে পারবে? তুমিতো চেনো না।—কিন্তু আমি, আমি কি করে তাঁকে অত অযত্ন করেছিলেম! আমি কি করে তাঁকে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে পারিনি? গরীব নিরঞ্জন বলেই না অমন করে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেম! তিনি যে আমারই মায়ের আনা রোগ ঘেঁটে নিজে রোগে পড়েছিলেন, তাঁকে যে মরা মানুষ মনে করে আমিই দাহ করতে নিয়ে যেতে দিয়েছিল উঃ, আমি কি! আমি কি! আমি কি!"

হাবড়া ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মে পা দিয়াই নরেশের সঙ্গে সাধুজীর দলের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। সাধু সানন্দে চেঁচাইয়া উঠিলেন "এই যে রাজা আমাদের তুলে দিতে এসেছেন!—জয়োস্তু!"

সাধুজীর সঙ্গে স্বাগত শেষ করিয়া নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল নিরঞ্জনের দিকে।, নিরঞ্জন এত লোকের মধ্যে তার মতন একটা

নগণ্য লোকের এতটা খাতির অশোভন হয় দেখিয়া নত হইয়া নরেশের পদধূলি লইতে গেলে নরেশ তাহাকে উত্তপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে একেবারে বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম কোপে হাসিয়া ধমক দিলেন, বলিলেন, "ফের বদ্‌মাইসি!"

তার পর ইহাঁরা ষ্টেশনের একপ্রান্তে একটু ভিড় ছাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, নরেশ বলিলেন, "নিরঞ্জন! মুক্তেশ্বর রায়ের নায়েব-দেওয়ান হরিশচন্দ্র মিত্র যে মহাপাতক করেছিলেন, তাঁর সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা—অর্থাৎ যেটা তিনি মুনিবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেটা আমি বিষয়ের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে এনেছি,—কোন কথা শুন্‌বো না নিতেই হবে। তোমার বাবা রত্নেশ্বরবাবু সেই সম্পত্তি হাতে পেয়েও একদিন আমার বাবাকে ছেড়ে দেন; সেই উপলক্ষে তিনি যে চিঠিখানি লেখেন, আমি বড় হয়ে সেখানি সযত্নে তুলে রেখেছি। চার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সেই চিঠি পেয়েই আমি তোমার খোঁজে চট্টগ্রাম গিয়ে জানতে পারি যে মাস কয়েক পূর্ব্বে তুমি মারা গেছ,—এবং তখন আর কোন পথ না পেয়ে—যদিই এতে আমাদের পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় ভেবে তোমারই শেষ চিহ্ন বলে তোমার পরিত্যক্তা"—

নিরঞ্জনের পা টলিয়া সে বসিয়া পড়িতেছিল, নরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া নিকটস্থ বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন। গৈরিকধারিণী সুষমা দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্ত্তা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল; নিরঞ্জনের সুশ্রুষার জন্য অগ্রসর হইতে গিয়া সে সাশ্চার্য্যে দেখিল, নিকটস্থ মেয়েদের বিশ্রামাগার হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া একটী তাহারই বয়সী মেয়ে সেই আধপাগলা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে পড়িয়া অশ্রুপরিপ্লুতমুখে বাষ্পগদ্‌গদ্‌স্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"রমেশ

দাদা! আমায় কি আপনি চিন্‌তে পারচেন না? আমি তো মরিনি,—আমিই যে সেই পোড়ারমুখী সুখদা।"